ড. মিল্টন বিশ্বাস
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বিসর্জন

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সমগ্র রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের মধ্যে 'বিসর্জন' আখ্যানবস্তুর সুনিপুণ বিন্যাস-কৌশলে, ঘটনার দ্রুত প্রবাহে, নাটকীয় চমৎকারিত্বে, পাত্রপাত্রীর অন্তরস্থিত ভাব ও বাহিরের কর্মের সম্মিলিত দ্বন্দ্বসংঘাতময়, বেগবান রূপের প্রকাশে, মঞ্চাভিনয়ের উপযোগিতায়, একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা তাঁহার বহু গঠিত ও বহু-প্রশংসিত নাটক । রূপক-সাংকেতিক-গভীর বাহিরে যে সমস্ত নাটক আছে, তাহাদের মধ্যে সকল দিক দিয়াই 'বিসর্জন' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

এই নাটকের আখ্যানভাগ রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন আছে। অপর্ণা ও গুণবতীর চরিত্র নাটকের নূতন সৃষ্টি।

'বিসর্জন'-এর কথা-বস্তু সকলেরই সুবিদিত, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইহার নাটকীয় কলাকৌশল ও চরিত্র সৃষ্টিই বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়।

এই নাটকের মূলদ্বন্দ্বটি হইতেছে ধর্মের অর্থহীন অন্ধসংস্কার ও চিরাচরিত যুক্তিহীন প্রথার সঙ্গে নিত্য-সত্য মানবধর্ম বা হৃদয়ধর্মের; মিথ্যা ধর্মবোধের সঙ্গে উদার মনুষ্যত্বের; মানুষের রচিত আচার বিধির সঙ্গে হৃদয়ের পরম-সত্য প্রেমের; হিংসার সঙ্গে অহিংসার । রঘুপতির মধ্যে এই মিথ্যা ধর্মবোধ ও অন্ধসংস্কার তাহার প্রচন্ড শক্তি লইয়া রূপায়িত, রানী গুণবতীর স্বার্থ-বিজড়িত সংস্কার ও প্রথামূলক ধর্মবোধ তাহার সাহায্যকারী, ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে নক্ষত্র রায়ের রাজ্যলাভ; এই দলের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম রঘুপতির মস্তিষ্ক দ্বারা চালিত। অন্য পক্ষরাজ গোবিন্দমাণিক্য উদার সত্যধর্ম, চিরন্তন হৃদয়ধর্ম বুকে আঁকড়াইয়া ধরে অচল, অটল পর্বতের মতো দন্ডায়মান তাঁহার পাশে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন ধর্মপ্রথার জীবন্ত প্রতিবাদ স্বরূপিণী, প্রেম ও হৃদয়বত্তার মূর্তিমতী প্রতীক অপর্ণা। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যপথে আছে জয়সিংহ। গুরুর উপদিষ্ট সংস্কার-ধর্ম ও অনুষ্ঠান-প্রথায় সে বিশ্বাসী, গুরুর উপর তাহার অচলা ভক্তি, কিন্তু মনুষ্যত্ব ও হৃদয় ধর্মের প্রেরণা তাহাকে বিচলিত করিয়াছে। এই আচারনিষ্ঠা ও বিবেকের দ্বন্দ্বে তাহার চিত্ত একবার এপক্ষের, আর একবার ওপক্ষের মধ্যে দোলায়িত হইয়াছে । কোনো পক্ষকেই সে একান্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে নাই। ফলে আত্মবিসর্জনেই তাহার দ্বন্দ্বের শেষ হইয়াছে।

নাটকের আরম্ভ হইয়াছে নিঃসন্তান রানী গুণবতীর সন্তান-কামনার দ্বারা একটি ক্ষুদ্র প্রাণকে বুকে চাপিবার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা,—

আমি হেথা
সোনার পালঙ্কে মহারানী শত শত
দাসদাসী সৈন্য প্রজা লয়ে বসে আছি
তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব—এই বক্ষ,বাহু দুটি,
এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে বিরচিতে
নিবিড় জীবন্ত নীড় শুধু একটুকু
প্রাণকণিকার তরে ।

এই আরম্ভের মধ্যে নাটকের মূলদ্বন্দ্বের এক পক্ষের যৌক্তিকতার অসারত্ব কৌশলে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে । রানী একটি ক্ষুদ্র প্রাণের জন্য ব্যাকুল, তাহাকে স্নেহ করিয়া, ভালোবাসিয়া তিনি জীবন সার্থক করিতে চান, কিন্তু এই প্রাণলাভের জন্য তিনি শত শত প্রাণ ধ্বংস করিতে উদ্যত । প্রাণের প্রতি স্নেহ-প্রেম মানুষের স্বভাবজ হৃদয়-ধর্ম, নিত্য-সত্যধর্ম, কিন্তু বলিরূপ অন্ধধর্মসংস্কার উহাকে রুদ্ধ করিয়াছে। প্রাণ-কামনার দ্বারা রানী প্রকৃতপক্ষে প্রেমেরই জয়ঘোষণা করিয়াছেন, মানুষের সত্যধর্মের পরিচয় দিয়াছেন ।

রাণী অজ্ঞাতসারে যে সত্যের আভাস দিলেন, তাহাই পূর্ণ ও প্রবল প্রতিবাদরূপে আবির্ভূত হইল অপর্ণার মধ্যে । অপর্ণার ছাগশিশু ধরিয়া আনিয়া মায়ের কাছে বলি দেওয়া হইয়াছে, ব্যথিত, রোরুদ্যমানা অপর্ণা রাজার কাছে তাহার বিচার চাহিতেছে। রাজা জয়সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলে, জয়সিংহ বলিল যে, 'বিশ্বমাতা' তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। অপর্ণা বলিতেছে—

কে তোমার বিশ্বমাতা ! মোর
শিশু চিনিবে না তারে । মা-হারা শাবক
জানে না সে আপন মায়েরে।...
আমি তার মাতা !...মা তাহারে নিয়েছেন ?
মিছে কথা ! রাক্ষসী নিয়েছে তারে।

অপর্ণার ছাগশিশুর বলিই নাটকের বিরোধের বীজ। এই বীজ অঙ্কুরিত হইল রাজার মনে,—

এ দান কি নেবেন জননী
প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে ।

তারপর বর্ধিত, পল্লবিত হইল রাজার আদেশে,—

মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে
হইল নিষেধ...
বালিকার মূর্তি ধরে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন,
জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

আর এই ভাবের বীজ জয়সিংহের প্রশান্ত, নিস্তরঙ্গ মনে প্রথম তরঙ্গ তুলিল । আচার-অনুষ্ঠাননিষ্ঠ জয়সিংহের কুয়াশাচ্ছন্ন মানস-গগনে অপ্রত্যাশিতভাবে এক নূতন বৈদ্যুতিক আলো চমকিয়া গেল। এই প্রথম তাহার মনে এক সমস্যার উদয় হইল,—

আজন্ম পূজিনু তোরে তবু তোর মায়া
বুঝিতে পারিনে। করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের. দয়া নাই বিশ্বজননীর।

এই সমস্যাই তাহার জীবনের সমস্যা, ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠান সত্য, না মানুষের হৃদয়ধর্ম সত্য—রঘুপতি সত্য না অপর্ণা সত্য ? এই দুই বিপরীতমুখী সত্যের সমন্বয় করিতে না পারিয়া অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত-হৃদয় জয়সিংহ প্রাণ বিসর্জন দিল।

আবার অপর্ণার দ্বারা রোপিত এই বীজেরই পরিণামস্বরূপে রঘুপতির মধ্যে রাজার বিরুদ্ধে বিরোধ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। অপর্ণাই প্রকারান্তরে 'বিসর্জন' নাটকের মূলদ্বন্দ্বের কারণ। তাহা হইলে, যে ভাবসত্য রানী গুণবতীর অজ্ঞাতসারে তাহার মনে বিকশিত এবং যাহার পূর্ণ প্রকাশ অপর্ণার মধ্যে, সেই প্রাণের প্রতি ভালোবাসাই কবি মূলনাটকের বিরোধের হেতুস্বরূপে প্রথমেই কৌশলে উপস্থাপন করিয়াছেন । কবি নিজেই এই কথাটি সহজ ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন.—।

নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রথমেই দেখা দিলেন রানী গুণবতী। তাঁর সন্তান হয়নি বলে সন্তানলাভ কারবার আকাঙ্ক্ষা দেবীকে জানাতে মন্দিরে এসেছেন। তিনি দেবীকে বললেন, 'আমাকে দয়া ক'রে সন্তান দাও। আমার সব আছে, দাস-দাসী-প্রজা কিছুর অভাব নেই, কিন্তু আমার তপ্তবক্ষে আমার প্রাণের মধ্যে আর-একটি প্রাণকে অনুভব করবার ইচ্ছা হয়েছে । আমি এমন একজনকে পেতে চাই যার প্রতি প্রেম আমার নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি হবে।' শিশু তো এতটুকু প্রাণের কণিকা, কিন্তু তাকে স্নেহ করবার জন্য মার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে আছে। তাকে জন্ম দিয়ে বাঁচিয়ে তুলে সে তার প্রতি তার সমস্ত সঞ্চিত ভালোবাসা অর্পণ করবে।

নাটকের গোড়াটা গুণবতীর এই ব্যাকুল প্রার্থনা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে কেন । তার কারণ হচ্ছে, প্রথমেই এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, একটুখানি যে প্রাণ প্রেমের কাছে তার মূল্য কতো বেশি । একদিকে রানী মানত করছেন যে, বিশ্বমাতার কাছে

ছাগশিশু বলি দেবেন; অন্যদিকে তিনি সেই বলির পরিবর্তে একটুকু প্রাণের কণার জন্য তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভালোবাসাটুকু ভোগ করতে চান। একদিকে তিনি প্রাণহানির বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ; অন্যদিকে প্রাণের প্রতি প্রাণের মমতা যে কতো বড়ো জিনিস তা বুঝেছেনে । সুতরাং রানীর মনে এক জায়গায় প্রাণের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছে; তিনি জানছেন, ভালবাসা এতো প্রগাঢ় হতে পারে যে তার জন্য লোকে নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ করে; আবার অপরপক্ষে অসহায় প্রাণীদের প্রাণের ক্রন্দন তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করেনি।

তারপর প্রথম অঙ্কে অপর্ণা এল সেই কথাটাই বোঝাতে। সে বললে, 'তুমি যদি একদিক দিয়ে বুঝতে পেরেছ যে প্রাণের আদর কতখানি, তুমি যদি মা হয়ে প্রাণকে লালনপালন করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছ, আর তার জন্য বিশ্বমাতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছ—তবে কেন অন্য প্রাণকে বলি দিয়ে এই উদ্দেশ্য সাধন করতে চাও। বিশ্বমাতা কি প্রাণকে বোঝেন না, তিনি কি প্রাণী হত্যায় খুশি হন । যদি তিনি তা বোঝেন তবে কেমন করে এ ভিক্ষা তাঁর কাছে করছ।' মায়ের ভিতর দিয়ে প্রাণের মমতা কী করে বিশ্বে প্রাকাশ পায়, অপর্ণা প্রথম দৃশ্যে সেই কথাটাই বলে গেল। গুণবতী সন্তান পাবার জন্য একশত ছাগ বলি দিতে চান, তিনি এত প্রাণের অপচয় করতে রাজী আছেন—অথচ চিন্তা করে দেখলেন না যে এই ভিক্ষার মধ্যে কতখানি নিষ্ঠুরতা আছে।

"প্রাণের মূল্য কত গভীর একদল সে কথা বুঝেছে, অন্য দল তা বোঝেনি—তাই দুই দলে বিরোধ বাধল।" (পরিশিষ্ঠ, বিসর্জন)।

তারপর উভয় পক্ষের বিরোধ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। রঘুপতি এই আদেশকে ধর্মের ব্যাপারে রাজার অন্যায় হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে করিয়া স্পর্ধাভরে রাজাকে বলিল,—

তুমি কি ভেবেছ মনে, ত্রিপুর-ঈশ্বরী
ত্রিপুরার প্রজা। প্রচারিবে তাঁর 'পরে
তোমার নিয়ম'? হরণ করিবে তাঁর
বলি? হেন সাধ্য নাই তব । আমি আছি
মায়ের সেবক ।

রঘুপতির বিশ্বাস, কলিকালে ব্রাহ্মণের উপরেই ধর্মরক্ষার ভার । রাজা যদি বিরূপ হয়, ব্রাহ্মণই সে-ভার বহন করিবে-ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে । ক্ষাত্রশক্তির সহিত ব্রহ্মতেজের যুদ্ধ হইবে,—

ঘোর কলি
এসেছে ঘনায়ে। বাহুবল রাহুসম
ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়—সিংহাসন

তোলে শির যজ্ঞবেদী' পরে । ...
বৈকুণ্ঠ কি আবার নিয়েছে
কেড়ে দৈত্যগণ। গিয়েছে দেবতা যত
রসাতলে? শুধু দানবে মানবে মিলে
বিশ্বের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ?
দেবতা না যদি থাকে, ব্রাহ্মণ রয়েছে।
ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দম্ভসিংহাসন
ছবিকাষ্ঠ হবে।

রাজার আদেশে রানীর পূজার বলি মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিল। ব্রাহ্মণের তেজ গর্ব ও দম্ভের প্রতিমূর্তি রঘুপতির কাছে এ এক প্রচন্ড আঘাত।—

এই-ছাড়া সর্বনাশ রাজদর্প
ক্রমে স্ফীত হয়ে করিতেছে অতিক্রম
পৃথিবীর রাজত্বের সীমা—বসিয়াছে
দেবতার দ্বার রোধ করি জননীর
ভক্তদের প্রতি দুই আঁখি রাঙাইয়া।

সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণত্বের উপর ক্ষিপ্ত রঘুপতির প্রচন্ড ধিক্কার ।

ধিক্, ধিক্ শতবার ধিক্ লক্ষবার।
কলির ব্রাহ্মণে ধিক্। ব্রহ্মশাপ কোথা
ব্যর্থ ব্রহ্মতেজ শুধু বক্ষে আপনার
আহত বৃশ্চিকসম আপনি দংশিছে
মিথ্যা ব্রহ্ম-আড়ম্বর ।
(পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত)

রাজ-আদেশ অমান্য করিয়া বলির দ্বারা পূজা করিবার আয়োজন করিলে গোবিন্দমাণিক্য মন্দিরে সৈন্যপাহারা বসাইলেন । ব্যর্থকাম, ক্রোধজর্জর , দাম্ভিক রঘুপতি রাজাকে শাসাইতেছে,—

অবিশ্বাসী, সত্যই কি হয়েছে ধারনা,
কলিযুগে ব্রহ্মতেজ গেছে—তাই এত দুঃসাহস?
যার নাই। যে দীপ্ত অনল
জ্বলিছে অন্তরে, সে তোমার সিংহাসনে
নিশ্চয় লাগিবে। নতুবা এ মনানলে

ছাই ক'রে পুড়াইব সব শাস্ত্র, সব
ব্রহ্মগর্ব ,সমস্ত তেত্রিশ কোটি মিথ্যা।
আজ নহে, মহারাজ রাজ-অধিরাজ,
এই দিন মনে কোরো আর-একদিন।

ইহার পর হইতেই রঘুপতি তাহার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য গোপনপথ অনুসরণ করিয়া রাজ হত্যার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। প্রথমে, রাজ্যের লোভ দেখাইয়া নক্ষত্ররায়কে দিয়া হত্যার চেষ্টা করিল; তারপর দুর্বলহৃদয় গুরুর উপর গভীর বিশ্বাসী জয়সিংহকে হত্যার সপক্ষে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া তাহার মন তৈয়ারী করিল; তারপর প্রতিমার পিছন হইতে 'রাজরক্ত চাই' বলিয়া চীৎকার করিয়া জয়সিংহকে জানাইল যে, দেবীই নিজে রাজরক্ত চাহিতেছেন। মন্দিরে সমাগত রাজ। রঘুপতির এই ছলনা ধরিয়া দিলে জয়সিংহের হস্ত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িল। রাজাকে হত্যা করা হইল না; তারপর রঘুপতি দেবীর চরণ স্পর্শ করাইয়া জয়সিংহকে প্রতিজ্ঞা করাইল যে, 'শ্রাবণের শেষরাত্রে এনে দিবে রাজরক্ত দেবীর চরণে'। অন্ধ ধর্মবোধের সঙ্গে তাহার ব্যক্তিগত ক্ষমতা লেপের জন্য আক্রোশ, দম্ভ ও প্রতিহিংসার বাসনা একত্রে মিলিয়া তাহাকে একটা বিরাট দৈত্যশক্তিতে পরিণত করিয়াছে।

রঘুপতির পক্ষের রানী গুণবতী রাজাকে বলি-বন্ধের আদেশ উঠাইয়া লইবার সনির্বন্ধ অনুরোধেও যখন সফলকাম হইলেন না , তখন তিনি প্রতিহিংসার পথ গ্রহণ করিলেন । এই সংস্কারধর্মের সঙ্গে তাঁহার স্বার্থবোধ জড়িত ছিল । তাঁহার অন্ধবিশ্বাস ছিল , বলির দ্বারা মাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই তিনি সন্তান লাভ কবিবেন, এই অসত্য ধর্মবোধ ও স্বার্থবোধ একত্রে জড়িত হইয়া তাঁহার প্রেমকে, পত্নীত্বকে, অস্বীকার করাইয়া তাঁহাকে রাজার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইল। একটি প্রাণ পাইবার জন্য তিনি অন্য একটি প্রাণ বলি দিতে উদ্যত হইলেন । রাজার একান্ত প্রিয়পাত্র শিশু ধ্রুবকে তিনি মায়ের কাছে বলি দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। রঘুপতি এই বলি দিতেও বিফলমনোরথ হইয়া বন্দী হইল ও নির্বাসন-দন্ডাজ্ঞা পাইল। কূটকৌশলী রঘুপতি জয়সিংহের প্রতিজ্ঞার কথা স্বরণ করিয়া শ্রাবণের শেষ দিনে রাজরক্তের আশায় কয়েকদিনের জন্য সময় প্রার্থনা করিল। এইখানেই রঘুপতি পক্ষের বিরোধ চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছিল।

অন্যদিকে রাজা প্রথম হইতেই নির্বিকার, অটল অচলভাবে তাঁহার সংকল্প সাধনে রত । সত্যের উপর, আদর্শের উপর তাঁহার অবিচল নিষ্ঠা। রানীর সনির্বন্ধ অনুরোধের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন,—

ধর্মহানি ব্রাহ্মণের নহে অধিকার ।
অসহায় জীবরক্তে নহে জননীর
পূজা।

সহস্র শত্রুর সঙ্গে তিনি একা যুদ্ধ করিতেছেন,—

নীচ স্বার্থ,
নিষ্ঠুর ক্ষমতাদর্প, অন্ধ অজ্ঞানতা,
চিররক্তপানে স্ফীত হিংস্র বৃদ্ধ প্রথা——
সহস্র শত্রুর সঙ্গে একা যুদ্ধ করি।

এই আদর্শেই অটল থাকিয়া তিনি একই দোষে দোষী রঘুপতি ও নক্ষত্রকে নির্বাসন দিয়াছেন। ইহাই রাজার পক্ষের বিরোধের চরম অবস্থা ।

ইহার পর হইতে উভয় পক্ষেরই বিরোধের অবসান হইল। জয়সিংহের আত্মবিসর্জনের প্রচন্ড আঘাতে রঘুপতির সমস্ত বিরুদ্ধতা ধূলিসাৎ হইয়াছে। আনুষ্ঠানিক ধর্মের উপর দৃঢ়নিষ্ঠা, ব্রাহ্মণ্যের গর্ব,আত্মাভিমান ও ক্ষমতার দম্ভ,এবং বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের বিরাট শক্তির আড়ালে লুকানো ছিল একটি দুর্বল স্থান। সে স্থানটি জয়সিংহের প্রতি অকৃত্রিম পুত্রস্নেহ । সেই স্থানে প্রচন্ড আঘাত লাগায় তাহার শক্তির ও ব্যক্তিত্বের অভ্রভেদী প্রাসাদ চুর্ণ হইয়া ধুলিসাৎ হইয়া গেল। অন্ধবিশ্বাসের বশীভূত হইয়া, আত্মাভিমান-তৃপ্তির উপকরণস্বরূপ যে নিঃসংকোচে অন্যের প্রাণ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার নিজের প্রাণস্বরূপ। জয়সিংহের প্রাণ বিসর্জনে সে বুঝিতে পারিয়াছে, প্রাণের কী মূল্য। নিজের অপূরণীয় ক্ষতির মূর্তি সে দেখিতে পাইয়াছে—অন্যের ক্ষতিও বুঝিতে পারিয়াছে । একটা বিরাট মিথ্যাকে সত্যের মুখোশ পরাইয়া দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞান শূন্য হইয়া তাহারই পিছেনে সে এতদিন ছুটিয়াছিল, আজ সেটার মিথ্যারূপ সে দেখিতে পাইল । তাই পাষাণ-প্রতিমাকে 'পিশাচী', 'মহারাক্ষসী' বলিয়া গালি দিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিল, এবং অমৃতময়ী জননী অপর্ণার সঙ্গে মন্দির ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

গোবিন্দমাণিক্যের বিরোধ দূর হইল অন্য কারণে। ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অশোভনতায় ও প্রজাদের রক্তপাতের আশঙ্কায় রাজা স্বেচ্ছায় রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কারণের বিভিন্নতার জন্য একমুখী বিরোধের স্বাভাবিক পরিণাম আসে নাই । রঘুপতির মোহমুক্তির পূর্বেই রাজা রাজ্য ছাড়িতে প্রস্তুত হইয়াছেন। রঘুপতির পরাজয় ও মোহমুক্তির মধ্যে রাজার আদর্শের জয় সুপ্রতিষ্ঠিত না হইবার পূর্বেই তিনি স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসন গ্রহণ করিতেছেন। নক্ষত্র রায় যে তাঁহাকে 'দেবদেবী' 'অবিচারী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, তাঁহার নির্বাসন কামনা করিয়াছে, তাঁহারি জন্য ক্ষুব্ধ অভিমানে যেন তিনি সিংহাসন ছাড়িয়া যাইতেছেন। যে-সত্য ও আদর্শ-প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সহস্র শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও অটল আছেন এবং রঘুপতির সমস্ত দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়াছেন, তাহার পরিণাম একটা রূপ ধারণ করিবার পুর্বেই কি তিনি একটা বিরক্তি ও হতাশায় রাজ্য ছাড়িতেছেন না? অবশ্য ভাবের দিক দিয়া দেখিলে আমরা বলিতে পারি যে, গোবিন্দমাণিক্যের সত্যধর্ম ও বৃহত্তর আদর্শেরই জয় হইয়াছে, রঘুপতি তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছে, এবং মহত্তর আদর্শ ও নীতির জন্য রাজা স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ

করিয়াছেন। পূর্ব হইতেই রাজার চরিত্র একটা মহৎ ধর্ম ও আদর্শের বাহনরূপেই কল্পিত হইয়াছে, তাই তাহার চিত্তে কোনো তরঙ্গোদ্বেলতা নাই, কর্মের মধ্যে চাঞ্চল্য নাই, দ্বন্দ্ব নাই । প্রত্যক্ষ নাটকের ক্ষেত্রে এই পরিণতিতে দুধর্ষ রঘুপতির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে রাজাকে যেন কতকটা দুর্বল দেখায় এবং নাটকীয় রসও খানিকটা চমৎকারিত্ব হারায়। অন্ততপক্ষে রঘুপতির পরিবর্তনের পর রাজার বৈরাগ্য ঘটাইলেও অনেকটা ভালো হইত।

এখন ইহার চরিত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে ।

প্রথমেই জয়সিংহের চরিত্র আমাদের দৃষ্টি আর্কষণ করে । সমগ্র রবীন্দ্রনাট্য-সাহিত্যের মধ্যে এমন সার্থক চরিত্রসৃষ্টি খুব কম দেখা যায়। অন্তর্দ্বন্দ্বই নাটকীয় চরিত্রের প্রাণ। ইহাই চরিত্রকে জীবন্ত করে । এই অন্তর্দ্বন্দ্বে নিপীড়িত জয়সিংহের চিত্তের যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার করুণ সৌন্দর্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

যে—মূলধাতুতে জয়সিংহ গড়া,তাহা কোমল, মালিন্যবর্জিত ও শুভ্র। বিশুদ্ধ মানবতার অংশ তাহাতে অনেক বেশি। সে হৃদয়বান, কবি, দার্শনিক,প্রেমিক। সেই জন্য সে সহজ-বিশ্বাসী অকপট ও দুর্বল। আশৈশব শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে সে আনুষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করে, কালীকে ভক্তি করে, তাঁহার পূজার মধ্যে সার্থকতা দেখে; রঘুপতির উপর তাঁহার দৃঢ় ভক্তি, সে তাহার পালক পিতা, গুরু। সে তাহার ধর্মবিশ্বাস লইয়া রঘুপতির বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়ায় মন্দিরের প্রাঙ্গণে দিন কাটাইতেছিল।

এমন সময় অপর্ণার আবির্ভাব। ছাগশিশুর জন্য অপর্ণার কান্না জয়সিংহের সংস্কারাচ্ছন্ন মনকে মুক্ত করিয়া তাহার নিজস্ব স্বরূপ অনেকখানি ব্যক্ত করিল । জয়সিংহের জীবনে ইহা এক নূতন অভিজ্ঞতা । একটা অনাবিষ্কৃত দেশ যেন সে আজ আবিষ্কার করিল । স্নেহ-প্রেম-দয়ার যে অনির্বচনীয় মাধুর্য, জয়সিংহ তাহা আজ আস্বাদন করিল। অপর্ণার আহ্বানে তাহার অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠিয়া প্রেমের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে সার্থকতা খুঁজিতে লাগিল । তাই জয়সিংহ বলিতেছে,—

তোমার মন্দিরে এ কী নূতন সংগীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি হে গিরিনন্দিনী,
করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে। ভক্তহৃদি
অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি।—

তাহার নবজাগ্রত হৃদয়ে এক নূতন সমস্যার উদয় হইল। মন্দিরের দেবী বিশ্বমাতা সত্যই কি প্রাণবলি চান, তবে প্রাণের জন্য মানুষের এত স্নেহ-প্রেম-দয়া, এত দরদ কেন ? এই আনুষ্টানিক পূজা সত্য, না স্নেহ-প্রেম সত্য ? মন্দিরের দেবী সত্য, না হৃদয়ের এই স্বভাব অনুভূতি সত্য ? কঠিন পাষাণ-প্রতিমার পূজায় তো হৃদয় ভরে না, সে যে জগতের সৌন্দর্যের মধ্যে, মানবের স্নেহ-প্রেমের মধ্যে ছুটিয়া যাইতে চায়। এ কি কঠিন সমস্যা। অথচ শাস্ত্র বলে, গুরু বলেন, এই নিরন্তর অনুষ্ঠানবহুল পূজার মধ্যেই সার্থকতা, কিন্তু সে সার্থকতায় তো চিত্ত ভরে না, শান্তি পাওয়া যায় না, সুখ পাওয়া

যায় না, মুক্তি পাওয়া যায় না, তাই জয়সিংহের জীবন তাহার কাছে শূন্য অনাবশ্যক মনে হয়,—

কেবলি একেলা! দক্ষিণ বাতাস যদি
বন্ধ হয়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি
নাহি আসে, দশ দিক জেগে উঠে যদি
দশটি সন্দেহসম, তখন কোথায়
সুখ,কোথা পথ। জান কি,একেলা কারে
বলে।.....
সৃজনের আগে
দেবতা যেমন একা! তাই বটে!
তাই বটে! মনে হয়, এ জীবন বড়ো
বেশী আছে—যত বড়ো তত শূন্য, তত
আবশ্যকহীন।

এই ব্যর্থ, নিরানন্দ জীবনের উপর তাহার প্রবল বিতৃষ্ণা আসিয়া গিয়াছে। রঘুপতি রাজহত্যার আয়োজন করিতেছে, দোদুল্যমানচিত্ত জয়সিংহের কানে হত্যার সপক্ষে দীর্ঘ বক্তৃতা দিতেছে, কিন্তু জয়সিংহ এ প্রস্তাব অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, তাই জয়সিংহ দেবীর উদ্দেশ্যে বলে,—

মায়াবিনী,পিশাচিনী,
মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস তুই
যার ছদ্মবেশ ধরে রক্তপান লোভে ?...--
প্রেম মিথ্যা,
স্নেহ মিথ্যা,দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর সব,
সত্য শুধু অনাদি-অনন্ত হিংসা ? -----

রঘুপতিকে বলে,—

ছি, ছি, ভক্তিপিপাসিতা মাতা, তাঁরে বল
রক্তপিপাসিনী

তারপর রঘুপতি যখন গর্জন করিয়া ওঠে,—

বন্ধ হোক বলিদান তবে।

তখনই জয়সিংহের ভাবনার মোড় ঘুরিয়া যায়,—

না, না, গুরুদেব, তুমি

জান ভালোমন্দ। সরল ভক্তির বিধি
শাস্ত্রবিধি নহে! আপন আলোকে আঁখি
দেখিতে না পায়, আলোক আকাশ হতে
আসে! প্রভু, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো দাসে।
ক্ষমা করো স্পর্ধা মূঢ়তার। ক্ষমা করো
নিতান্ত বেদনাবশে উদভ্রান্ত প্রলাপ।
বলো, প্রভু, সত্যই কি রাজরক্ত চান
মহাদেবী।

রঘুপতি।

হায় বৎস, হায়, অবশেষে
অবিশ্বাস মোর প্রতি ?

জয়সিংহ।

অবিশ্বাস ? কভু
নহে। তোমারে ছাড়িলে বিশ্বাস আমার
দাঁড়াবে কোথায়। বাসুকির শিরশ্চ্যুত
বসুধার মত শূন্য হতে শূন্যে পাবে
লোপ। রাজরক্ত চায় তবে মহামায়া—
সে রক্ত আনিব আমি। দিব না ঘটিতে
ভ্রাতৃহত্যা।

ইহাই জয়সিংহের মনের অস্থির কম্পমান চিত্র।

তাহাকে হৃদয়ের ধর্ম ও স্নেহ-প্রেম টানিতেছে একদিকে , শাস্ত্রবিধি ও গুরুর প্রতি অটল বিশ্বাস টানিতেছে অপরদিকে, ঘড়ির দোলকের মতো এইভাবে তাহার মন একবার এদিকে আরবার ওদিকে যাতায়াত করিতেছে। বন্ধন ও আকর্ষণ উভয়েই সমান শক্তিশালী। প্রতিমা ও রঘুপতির বন্ধন যেমন কঠিন, অপর্ণার আকর্ষণও তেমনিই প্রবল।

এই নিরন্তর 'সংশয়' ও চিন্তা-জর্জরিত জয়সিংহের কাছে জগৎ ও জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য মায়ামাত্র, জীবন ক্ষণিক,অর্থহীন।

সব মিথ্যা বৃহৎ বঞ্চনা –
তাই হাসিতেছি, তাই গাহিতেছি, গান।....
মিথ্যা বলে তাই এত হাসি ; শ্মশানের
কোলে ব'সে খেলা, বেদনার পাশে শুয়ে

গান, হিংসাব্যাঘ্রিনীর খর নখতলে
চলিতেছে প্রতি দিবসের কর্মকাজ।
সত্য হলে এমন কি হত । হা অপর্ণা,
তুমি আমি কিছু সত্য নই, তাই জেনে
সুখী হও।....
যেমন ক'রেই যাই, দিবা-অবসানে
পৌঁছিব জীবনের অন্তিম পলকে;
আচার-বিচার-তর্ক-বিতর্কের জাল
কোথা মিশে যাবে। ক্ষুদ্র এই পরিশ্রান্ত
নবজন্ম সমর্পিব ধরণীর কোলে;

দিশেহারা,উদার হৃদয়ের ইহা মর্মান্তিক বৈরাগ্য!

গুরুর নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া রাজহত্যার জন্য প্রস্তুত হইলে, যখন জয়সিংহ জানিতে পারিল যে, রঘুপতিই দেবীর পিছন দিক হইতে "রাজরক্ত চাই" বলিয়া চীৎকার করিয়াছে, তখনই ছুরিকা ফেলিয়া দিল। মাতা বিমুখ হইয়াছেন রব উঠিলে, যখন জানিল যে, রঘুপতিই প্রতিমার মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছে, দেবী সত্যই মুখ ফেরান নাই, তখন জয়সিংহের সংশয়ের ভার একটু কমিয়াছে।—

মিথ্যা,মিথ্যা, মিথ্যা। দেবী নাই প্রতিমার
মাঝে, তবে কোথা আছে ? কোথাও সে নাই।
দেবী নাই। ধন্য,ধন্য, ধন্য মিথ্যা তুমি।

তবে কি তাহার আজন্মের পূজা, শাস্ত্রবিধি পালন, মায়ের প্রতি তাহার অবিচলিত ভক্তি অর্থহীন, নিষ্ফল ? এই মিথ্যা কি সত্য হয় না ?

তাই তাহার চরম কাতরোক্তি,—

দেবী,আছ,আছ তুমি ! দেবী থাকো। তুমি ।
এ অসীম রজনীর সর্বপ্রান্তশেষে
যদি থাক কণামাত্র হয়ে, সেথা হতে
ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও ,বলো মোরে
'বৎস আছি'। –নাই! নাই! দেবী নাই।
নাই ? দয়া করে থাকো। অরি মায়াময়ী
মিথ্যা,দয়া কর, দয়া কর জয়সিংহে,
সত্য হয়ে ওঠ্। আশৈশব ভক্তি মোর,

আজন্মের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে
এত মিথ্যা তুই?—এ জীবন কারে দিলি,
জয়সিংহ। সব ফেলে দিলি সত্যশূন্য
দয়াশূন্য মাতৃশূন্য সর্বশূন্য-মাঝে।

জয়সিংহ দেবীর প্রতি ভক্তি অপেক্ষা মানবের প্রেমকেই নিকটতর করিয়া পাইতে চায়,—

দেবতায়
কোন্ আবশ্যক! কেন তারে ডেকে আনি
আমাদের ছোটোখাটো সুখের সংসারে।
তারা কি মোদের ব্যথা বুঝে। পাষাণের
মতো শুধু চেয়ে থাকে; আপন ভায়েরে
প্রেম হতে বঞ্চিত করিয়া, সেই প্রেম
দিই তারে, সে কি তার কোনো কাজে লাগে।
এ সুন্দরী সুখময়ী ধরনী হইতে
মুখ ফিরাইয়া,তার দিকে চেয়ে থাকি—
সে কোথায় চায়।

অপর্ণা তাহাকে মন্দির ছাড়িয়া যাইতে বলে। এখন আর মন্দিরে থাকা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সেও তাহা বুঝিয়াছে। কিন্তু গুরুর নিকট তাহার প্রতিজ্ঞা পালিত হয় নাই। তাহা ছাড়া পিতৃতুল্য গুরুর স্নেহ-বন্ধন আছে, কর্তব্যের বন্ধন আছে; আনুষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস ঘুচিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু রঘুপতির ব্যক্তিগত বন্ধন আছে। তাহা তো জয়সিংহর পক্ষে অচ্ছেদ্য। জীবন শেষ না করিলে সে বন্ধন ছিন্ন করা যাইবে না, তাই তাহার সংকল্প,—

যাব,যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে
যাব। হায় রে অপর্ণা,তাই যেতে হবে।
তবু যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ করে দিয়ে তার রাজকর
তবে যেতে পাব।

ইহার পরেই জয়সিংহের আত্মবিসর্জন।

কবি সুনিপুণভাবে জয়সিংহের চিত্তের দ্বন্দ্বটি ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত করিয়া অবশ্যম্ভাবী পরিণামের দিকে লইয়া গিয়াছেন।

কোনো নাট্য-চরিত্রের ট্র্যাজেডির কারণ-নির্ণয়ে পাশ্চাত্য নাট্যসমালোচকগণ যে, 'Inherent weakness of character' অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, জয়সিংহের চরিত্রের সেই অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই তাহার জীবনের শোচনীয় পরিণামের জন্য দায়ী। সেই দুর্বলতা আসিয়াছে তাহার মনুষ্যত্ব হইতে, তাহার পবিত্র নিষ্কলঙ্ক হৃদয় হইতে। একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। যে ধাতুতে সে গড়া, সে-ধাতু উদার প্রেমিকের ধাতু, কবি ও দার্শনিকের ধাতু। তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা নাই, স্বার্থবুদ্ধি নাই। আজন্ম শিক্ষা ও সংস্কারের বশে, মা মন্দিরে আছেন এবং রক্তবলি কামনা করেন, ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে; এই তাহার অন্তরতম উদার ও প্রেমিক সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, অপর্ণার চোখের জলে সে সেই প্রকৃত জীবনের সন্ধান পাইল। প্রেমের স্পর্শে যখন সে জীবনের আনন্দময় স্বরূপের সন্ধান পাইল, তখন পূর্বের সংস্কার মিথ্যা বলিয়া মনে হইল; কিন্তু লৌকিক বুদ্ধি দ্বারা সে চালিত নয়, তাই সে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুবিধামত আপোষ করিতে পারিল না পারিপার্শ্বিকের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে সংকোচ বোধ করিল এবং শেষে মৃত্যুতেই মুক্তিকামনা করিল। নির্মল নিষ্পাপ অপট আদর্শবাদী লোকেদের জীবনে এইভাবেই দুঃখ নামিয়া আসে।

তারপর,রঘুপতি।

আনুষ্ঠানিক ধর্মসংস্কারের প্রতি অন্ধবিশ্বাস ও সেই ধর্মকে রক্ষা করিবার দায়িত্ববোধ ও তাহার প্রতিনিধিদের গর্বই রঘুপতি-চরিত্রের মূলভিত্তি। এই ধর্মকে রক্ষা ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার সঙ্গে জড়িত তাহার সমস্ত মর্যাদা ও আত্মসম্মান, তাহার ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও মান প্রতিপত্তি। তাই সে ইহার উপর কাহারো হস্তক্ষেপ সহ্য করে না, মনে করে—এই ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য তাহার ব্যক্তিত্বের প্রতি অসম্মান, যে শক্তি এই ধর্মের ধারক সেই ব্রাহ্মণ্যরক্তের অমর্যাদা, রাজার বলি বন্ধের আদেশ রঘুপতির ধর্ম প্রতিনিধিত্বেরই ও অস্বীকৃতি । তাই রাজার সহিত রঘুপতির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। রাজার হিংসাবর্জিত হৃদয় ধর্মের সহিত রঘুপতির হিংসাত্মক আনুষ্ঠানিক ধর্মের যুদ্ধ ততখানি নয়, তখনি মনুষ্যত্বের সাধক রাজার সঙ্গে রঘুপতির ব্যক্তিত্বের যুদ্ধ—তাহার আত্মাভিমানের দ্বন্দ্ব।

রঘুপতি এক বিরাট শক্তির মূর্তিমান প্রকাশ । অসাধারণ তাহার বুদ্ধি ও সাহস, অদ্ভুত তাহার উদ্দেশ্যসাধনে দৃঢ়চিত্ততা ও কর্মকৌশল। কেবল আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া ধন-জন-বলহীন এই ব্রাহ্মণ রাজশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। তাহার অধিকার, তাহার একচ্ছত্রাধিপত্য হইতে বিচ্যুত করিবার সমস্ত প্রচেষ্টা সে ব্যর্থ করিবেই। ইহাতে তাহার সত্য মিথ্যা নাই পাপপূণ্যজ্ঞান নাই বিবেকের দংশন নাই। সে নক্ষত্র রায়কে বিদ্রোহী হইতে প্ররোচিত করিয়াছে, প্রতিমার মুখ ফিরাইয়া রাখিয়া সরল বিশ্বাস পরায়ণ প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছে, প্রতিমার আড়ালে লুকাইয়া "রক্ত চাই" বলিয়া চীৎকার করিয়া দুর্বলচিত্ত জয়সিংহকে রাজহত্যায় নিয়োগ করিয়াছে,এবং শেষে নির্বাসনদন্ড পাইয়াও চরম প্রতিশোধের আশায় কয়েকদিনের জন্য সময় ভিক্ষা

করিয়াছে। প্রবল রাজশক্তির সহিত সে নানা ছলে ও বুদ্ধির কৌশলে অবিরাম যুদ্ধ করিয়াছে। ন্যায়-অন্যায়-বিচারহীন বিবেক-বর্জিত, দাম্ভিক আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিযান চলিয়াছে অক্লান্ত ভাবে।

তাহার মৃত্যুবাণ কিন্তু তাহার নিজের মধ্যেই লুকায়িত ছিল। সে বাণ তাহার আবাল্যপালিত জয়সিংহের প্রতি পুত্রাধিক স্নেহ। তাহার জীবনের প্রবল বিরুদ্ধ শক্তি তাহার অন্তরেই গোপন ছিল । যে স্নেহ প্রেমকে বহির্জীবনে সে দলিত মথিত করিতেছে সর্ব প্রকারে রুদ্ধ করিতেছে, সেই স্নেহ প্রেম তাহার অন্তরের এককোণে অবরুদ্ধ আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া ছিল, হঠাৎ তাহা অতি প্রচন্ড বেগে আত্ম প্রকাশ করিয়া তাহার সমস্ত সংস্কার আত্মাভিমান, বুদ্ধির দম্ভ কর্মপ্রচেষ্টা এক মুহূর্তে চূর্ণ করিয়া দিল। জয়সিংহের মৃত্যু সেই অবরুদ্ধ আচ্ছন্ন স্রোতোধারাকে হঠাৎ কূলপ্লাবনী মহানদীতে পরিণত করিয়া রঘুপতিকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। ধর্মের সংস্কার ও বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রতি অন্ধনিষ্ঠা অন্তরের পশুশক্তিকেই উদ্দীপিত করে, হৃদয়হীনতাতেই তাহার প্রকাশ। অপর দিকে স্নেহ প্রেম দেবশক্তিকে উদ্বোধিত করে সকলকে বুকে আকড়াইয়া ধরার মধ্যেই তাহার অভিব্যক্তি। রঘুপতির পশু অংশ হারিয়ে রাজশক্তির সহিত সংগ্রাম করিতেছিল, কিন্তু সে চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল নিজেরই দেব-অংশের হাতে-বৃহত্তর অংশের হাতে। নিদারুণ বেদনার মধ্য দিয়া সে স্নেহ প্রেমের প্রকৃত মর্যাদা বুঝিল, তাহার নবজন্ম হইল। অহংকার ,অভিমান, দেবতা ব্রাহ্মণ সব গেল, তবুও জয়সিংহকে ফিরিয়া পাওয়া গেল না । কিন্তু মৃত জয়সিংহের আত্মিক শক্তিতে তাহার পুনজন্ম হইল। শিষ্য জয়সিংহ মরিয়া গুরু রঘুপতির অন্তরাত্মাকে বাঁচাইল।

রঘুপতির দৃঢ় বিশ্বাস, তেজ, দম্ভ, অহংকার এক নিমিষেই যে ধূলিসাৎ হইয়া গেল এবং যাহাকে সে চরম সত্য বলিয়া ধরিয়াছিল, সেটা পরম মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল—ইহার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকত্ব নাই। এই রূপ প্রচন্ড শক্তিশালী একমুখী হৃদয়াবেগের ইহাই রহস্য। ইহাই রঘুপতির জীবনের সম্ভাব্য পরিণতি-প্রথম হইতেই দেখা যায়, রঘুপতির চরিত্রে কোনো দ্বন্দ্ব নাই, সন্দেহ-সংশয় বিচার বিতর্ক বা বিবেকের দংশন নাই , একটি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রচন্ড আত্মাভিমানকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার সমস্ত চিন্তা ও কর্ম আবর্তিত হইতেছিল, তাহার মধ্যে কোনো ফাঁক বা শিথিলতা ছিল না; সেই মূলকেন্দ্রটিই যখন চূর্ণ হইয়া গেল তখন তাহার চিন্তা ও কর্ম একবারে বিপরীত মুখে ঘুরিয়া গেল। জীবনের এই আকস্মিক রূপান্তরের দৃষ্টান্ত দস্যু রত্নাকর হইতে আরম্ভ করিয়া জগাই-মাধাই প্রভৃতির মধ্য দিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু দেখা যায়।

কিন্তু এই ধর্মমত ও জীবনযাত্রা আমূল পরিবর্তন রঘুপতির জীবনের ঘনীভূত ট্র্যাজেডিকে অনেকখানি হাল্কা করিয়া দিয়াছে । তাহার প্রাণাধিক প্রিয় জয়সিংহ যে তাহার প্রচন্ড অহংকারের বলি, এই মর্মান্তিক চেতনার মধ্যেই তাহার জীবনের ট্র্যাজেডি নিহিত; আমরণ এই বেদনার তুষানল তাহাকে দগ্ধ করিতে থাকিবে, এইরূপ কল্পনার

সুযোগ দিলে নাটকীয়ত্বের দিক দিয়া রঘুপতি-চরিত্র অধিকতর ঔজ্জ্বল্য লাভ করিত । কিন্তু জয়সিংহের মৃত্যু যেন তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান দিয়াছে, তাহার হৃদয় হইতে কুসংস্কার ও হিংসা দুর করিয়া জীবনের প্রকৃতরূপের সন্ধান দিয়াছে। 'মূক, পঙ্গু, অন্ধ, বধির, জড় পাষাণের মধ্যে যে সত্যকার দেবী নাই, সেই সত্য জানিয়া রঘুপতি দেবীকে জলে নিক্ষেপ করিয়াছে, অপর্ণাকে অমৃতময়ী প্রত্যক্ষ দেবী বলিয়া তাহার সহিত মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। জয়সিংহের মৃত্যু তাহাকে মোহমুক্ত করিয়া পরম উপকার করিয়াছে, এইরূপ কল্পনার স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে আসে । মনে হয়, শেষের দিকে কবি রঘুপতি চরিত্রের মধ্যে তাহার মনোগত একটা ভাবের রূপ প্রকাশ করিতেই বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল, সেই জন্য মানবিক বাস্তব রসের দিকে বেশি লক্ষ্য দেন নাই তাহার ফলে এমন অপূর্ব নাটকীয় চরিত্রটি যেন একটু স্তব্ধ হইয়াছে। ধর্মের অন্ধকুসংস্কার ভীষণ প্রচন্ড ও আত্মঘাতী হয়,কিন্তু শেষে প্রেমের হাতে তাহার চরম পরাজয় হয়—এই ভাবটি প্রকাশের উপরই কবি বেশি জোর দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

রঘুপতি যখনই পাষাণ প্রতিমার মধ্যে দেবী নাই বলিয়াছে,অমনি তাহার সপক্ষ গুণবতীরও রূপান্তর হইয়াছে। স্বামীর প্রতি তাহার অবিশ্বাস দূরে হইয়াছে এবং তিনি প্রকৃত প্রেমের মর্যাদা বুঝিতে পারিয়াছেন,—

আজ দেবী নাই—
তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা।

গোবিন্দমাণিক্য ও এক নূতন প্রেমের রাজ্যের কথা বলিতেছেন,—

গেছে পাপ। দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া
আমার দেবীর মাঝে।

পরিণামে দেখা যায়—সংস্কার-ধর্মের উপরে প্রেম-ধর্মের জয় ঘোষণা করাই যেন এই নাটকের মূখ্য উদ্দেশ্য।

রঘুপতির প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রও একেবারে দ্বন্দ্বহীন এবং একমুখী গতিবিশিষ্ঠ। তাঁহার মনে সন্দেহ-সংশয় নাই, বিচার বিতর্ক নাই; একটা উচ্চ আদর্শ ও মহৎ নীতিকেই তিনি জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছেন এবং নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও পারিপার্শ্বিকের দারুণ বিরোদ্ধতা সত্ত্বেও অচঞ্চল ও নির্বিকার থাকিয়া মনুষ্যত্বের আদর্শকেই অনুসরণ করিয়াছেন। রঘুপতি-চরিত্রে একমুখিতা বিচিত্র ঘটনার সংস্পর্শে নব-নব রসে ও চমৎকারিত্বে আমাদের মুগ্ধ করে কিন্তু ঘটনা প্রবাহের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্যের একই অভিব্যক্তি, কোনো নূতনত্বের আস্বাদ দেয় না । চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়া গোবিন্দমাণিক্য চরিত্রকে নিষ্প্রভ মনে হইলেও একটা ভাব বা তত্ত্বের বাহন হিসাবে ইহার সার্থকতা আছে। সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উর্ধ্বে যে আদর্শচরিত্র, কবি তাহাই রূপায়িত করিয়াছেন গোবিন্দমাণিক্য। তিনি কেবল রাজা নহেন তিনি রাজর্ষি।

আর একটি চরিত্র অপর্ণা । এই রহস্যময়ীর স্থান রূপক-সাংকেতিক নাটকের আসরে হইলেই অধিকতর শোভন হইত । যে শক্তি নাটকে জয়ী হইল সেই স্নেহ-প্রেমের ভাবমূর্তি অপর্ণা। সে শক্তি নাটকের মধ্যে প্রলয়ংকরী শক্তিবাণ অভিব্যক্ত। এই শক্তি নাটকের ঘটনা-প্রবাহের সহিত জড়িত নয়, ঘটনার বাহিরে দাঁড়াইয়া অদৃশ্য লোক হইতে যেন নাটকের মধ্যে তাহার অমোঘ প্রভাব নিক্ষেপ করিতেছে। নাটকের মধ্যে অপর্ণার স্থান নগণ্য; কিন্তু তাহার প্রভাব নাটকের সর্বত্র। সে জয়সিংহকে বিগলিত করিয়াছে, রাজাকে স্বপ্ন হইতে জাগরিত করিয়াছে,—

এতদিন স্বপ্নে ছিনু
আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি ধরে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন
জীবরক্ত সহে না তাহার ।

রঘুপতিকেও সে পরোক্ষভাবে দূর হইতে আকর্ষণ করিয়া শেষে তাহার উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। নাটক পরোক্ষভাবে তাহারই জয় ঘোষণা করিতেছে ।

অপর্ণা-চরিত্রের মানবিক অংশ অপরিস্ফুট ও ক্ষীণ। সে একটা ছায়ামূর্তি বলিয়া মনে হয় । সে যেন প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর রঘুদুহিতারই আর একটা রূপ। জয়সিংহের প্রতি তাহার প্রেমের পূর্ব-পর উদ্ভব ও পরিণতি নাই, আবেগের স্পন্দন নাই চিত্তদ্বন্দ্ব নাই। তাহার সমস্ত কার্য অন্তরের মধ্যে একটা ভাবের উদ্বোধনের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। একটা অশরীরিণী বাণীর মতো সংস্কারাচ্ছন্ন চিত্তের দ্বারে সে কেবলই ধ্বনিত করিয়াছে, 'এই অন্ধ সংস্কার ও হিংসা ছাড়িয়া প্রেম ও মানবতার মধ্যে চলিয়া আইস'। জয়সিংহকে সে পুনঃ পুনঃ মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে বলিয়াছে, শেষদৃশ্যে সে শোকোন্মত্ত রঘুপতিকে বলিয়াছে,—'পিতা, এসো এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা, পিতা চলে এস'। প্রেম ও মানবতার মধ্যেই যে জীবনের সার্থকতা, তাহার ইঙ্গিত দিবার জন্যই যেন তাহার সৃষ্টি।

(রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা)।

বিসর্জন

সুকুমার সেন

রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার প্রথম স্তরে কারুণ্যস্নেহের আলোকে হৃদয়ারণ্য হইতে নিষ্ক্রমণ সূচিত । দ্বিতীয় স্তরে কর্তব্যের সঙ্গে প্রেমের, রূপের সঙ্গে রসের সংসারের সঙ্গে সত্যের সংঘর্ষ প্রতিফলিত । রাজা-ও-রাণীতে এই বিরোধের অবসান ঘটিয়াছে আত্মবিসর্জনে । বিসর্জন (১৮৯১) নাটকে শুধু আত্মবিসর্জন আছে, কিন্তু শুধু তাহাতেই সমস্যার সমাধান মিলে নাই, আরো উপরে কঠোরতর ত্যাগের মধ্য দিয়া বিরোধের অবসান মিলিয়াছে । বৌঠাকুরাণীর-হাটে যেমন রাজা-ও-রাণীতে তেমনি প্রেমের শ্রান্তি সৌভ্রাত্র্যের ছায়ায় অপনোদিত । কিন্তু বিসর্জনে এবং রাজর্ষিতে শুষ্ক কর্তব্যের তৃষা বাৎসল্যের ধারাবর্ষণে মিটিয়াছে। বিসর্জনের সমস্যা,—"কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ"।

বিসর্জন রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা পরিচিত-ধরনের বিশিষ্ট নাটক । অভিনয়ের দিক দিয়াও বিসর্জনের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত । নাট্যরচনায়ও রবীন্দ্রনাথ শেষ অবধি নূতন নূতন ধাঁচ ও ছাঁচ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি তাঁহার কখনো রুচিকর ছিল না । কবিতায় ও গানে যেমন রচনার রূপটি প্রথম হইতেই রবীন্দ্রনাথের মনে সুস্পষ্ট আকার লইত নাটকে সর্বদা তেমন নয় । এবং বিসর্জনে ইহার ব্যতিক্রম পাই । তাই অভিনয়ে প্রয়োজন উপলক্ষ্যে ইহাতে পুনঃপুনঃ পরিবর্তন ঘটিয়াছে ।

রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশ লইয়া বিসর্জনের আখ্যানবস্তু পরিকল্পিত। । রাজর্ষির নায়ক গোবিন্দমাণিক্য, বিসর্জনের নায়ক জয়সিংহ । তাই জয়সিংহের আত্মহত্যা নাট্যকাহিনীতে যবনিকাপাত করিয়াছে। প্রথম সংস্করণে রাজর্ষির সঙ্গে যোগ বেশি স্পষ্ট ছিল । দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে হাসির ও কেদারেশ্বরের ভূমিকা বাদ যাওয়ায় এই যোগ কতকটা অস্পষ্ট হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের আরো দুইটি ভূমিকা-অন্ধ বৃদ্ধ ও পরিচারিকা-দ্বিতীয় সংস্করণে বাদ গিয়াছে । ধ্রুবর ও অপর্ণার ভূমিকাও ছোট হইয়াছে।

বিসর্জনে নাট্যরস জমিয়াছে অন্ধ সংস্কার, মূঢ় কর্তব্যনিষ্ঠা ও ভ্রান্ত অধিকাররোধের সঙ্গে গভীর হৃদয়বৃত্তি, উদার জ্ঞান ও নিরাসক্ত জীবনবোধের সংঘর্ষে। এই দ্বন্দ্বের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি অনুভব করিয়াছে নায়ক জয়সিংহ। অন্যথা একপক্ষে রঘুপতি ও গুণবতী,অপর পক্ষে গোবিন্দমাণিক্যের ও অপর্ণার। গোবিন্দমাণিক্যর ও অপর্ণার মনে সংশয় নাই, তাহারা গভীর অনুভবের মধ্য দিয়া সত্যের আলোক পাইয়াছে । রঘুপতির চরিত্রদৃঢ়তার প্রতিষ্ঠা তাহার নিষ্ঠায়। গুণময়ীর চিত্ত বারে বারে দোল খাইয়াছে প্রেম ও সংস্কারের মধ্যে । সে সন্তানবিহীন, স্বামীর উপর কর্তৃত্বহানির আশঙ্কায় অভিমানিনী । তাহার এই অত্যন্ত স্বাভাবিক দৌর্বল্যের ছিদ্রপথেই কাহিনীটি নাটকীয় পরিণতির দিকে উৎসারিত হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণে অপর্ণার ভূমিকা ছিল দীর্ঘতর, তাহাতে জয়সিংহের সহিত তাহার সম্পর্কের একটা পশ্চাৎপটও ছিল । পরে তাহা ছাঁটিয়া ফেলায় কাহিনী আরও সংহত

এবং নাট্যকৌতূহল আরও জমাট হইয়াছে । হাসির ভূমিকা বাদ যাওয়ায় আর ধ্রুবর ভূমিকা ছোট হওয়ায় গোবিন্দমাণিক্য-ভূমিকা নাট্যোপযোগিতা বাড়িয়াছে । কিন্তু ক্ষতিও হইয়াছে। গুণবতীর মানবিকতা কমিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ তাহার ট্র্যাজেডি কতকটা অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছে।

আবাল্য মাতাপিতৃহীন জয়সিংহ মানুষ হইয়াছে দেবীমন্দিরে রঘুপতির আশ্রয়ে। ব্রহ্মচারী তপস্বী পূজারী রঘুপতিকে অবলম্বন করিয়া তাহার শিশুহৃদয় বিকশিত। একটু বড় হইলে দেবীভক্তি তাহার মন অধিকার করিল । আরো বড় হইলে গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রমাধুর্য তাহার মনের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিল ।

মনে রেখো,দেবী আর গুরুদেব,
আর রাজা গোবিন্দমাণিক্য,এ দাসের
তিনটি দেবতা

মন্দির-আশ্রমে প্রকৃতির অকৃত্রিম পরিবেষ্টনে জয়সিংহের কিশোর মন বাড়িয়া উঠিয়াছে দেবীপ্রতিমার কল্পনায় ও অনুধ্যানে, সঙ্গী মুক তরুলতার মতোই সারল্যে ও নীরব নিষ্ঠায় । নবযৌবনের অবোধ বেদনা তাহার মনে ক্ষণে ক্ষণে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতেছে। মনের মধ্যে কিসের যেন অভাব ভক্তিরসের শান্ত সুষুপ্তির মধ্যে অতৃপ্তির কাঁটা বিধাঁইতেছে।

উদাসীন
ঋতাসের মত উতলা পরাণ ,হুহু
চলে যায়-কোন্ ছায়ামুগ্ধ কুঞ্জবনে ,
কোন্ স্বপ্নলোকে ! যেন খেলাইতে ডাকে
কে আমার আপন বয়সী,

অপর্ণার মর্মবেদনার ঢেউ আসিয়া জয়সিংহের হৃদয়ে চেতনার আঘাত করে।

তোমার হৃদয়ব্যথা আমার হৃদয়ে
এসে পেয়েছে চিরজীবন।

এই ব্যথার রাখী দুইটি হৃদয়ের মধ্যে অদৃশ্য বন্ধন বাঁধিয়া দিল। জয়সিংহ এখন বুঝিল।

শুধু ধরা দেও তুমি মানবের মাঝে,
মন্দিরের মাঝে নয়।

গোবিন্দমাণিক্য দেবীপূজায় বলি নিষেধ করিয়াছেন , শুনিয়া জয়সিংহ হৃদয়ে প্রথম আঘাত পাইল। দেবীর প্রতি তাহার ভক্তি এবং রঘুপতির উপর নিষ্ঠা দৃঢ়তর হইল। তাহার—

তিনটি দেবতা ছিল, এক গেল ! শুধু
দুটি আছে বাকি ।

কিন্তু মন তো যুক্তির বশ নয়। গোবিন্দমাণিক্য তাহার মনে যে শ্রদ্ধাপ্রীতির আলো জ্বালাইয়াছিল তাহা সে দেবীর মুখে প্রতিফলিত দেখিয়াছিল। এখন সে দীপ নিভিয়া গেলে পর ভক্তির জোর কমিয়া আসিল! জয়সিংহের ভক্তি-বিশ্বাসে টোল পড়িল । জয়সিংহের

মনে দ্বিতীয় এবং প্রচন্ডতর আঘাত লাগিল রাজরক্তের জন্য রঘুপতির ভ্রাতৃহত্যাষড়যন্ত্রে। ইহাতে যুগপৎ দেবীভক্তিতে ও গুরুভক্তিতে তাহার সংশয় জাগিল , তাহার মনে সংস্কার ও সদ্‌বুদ্ধির দ্বন্দ্ব বাধিল । রঘুপতির উপর আস্থা জয়সিংহের জীবনের ভিত্তি। তাই রঘুপতিকে সে ভ্রাতৃহত্যা পাপের অংশভাগী হইতে দিবে না, রাজরক্ত সে নিজেই আনিয়া দিবে । আপাতত সংস্কারের কাছে সদ্‌বুদ্ধির পরাজয় ঘটিল বটে কিন্তু তাহার মধ্যেও উজ্জ্বলতর হইল গুরুভক্তি। তবে মনের দ্বন্দ্ব ঘুচিল না । অপর্ণার গান তাহার মনে জীবনের সহজ আনন্দের সাড়া জাগায়, কিন্তু সে আনন্দ -আবেশ টুটাইয়া দিল রঘুপতি। তাহাকে অপর্ণা শাপ দিল।

নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ! ধিক্
থাক ব্রাহ্মণত্বে তব! আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ বন্ধনে
জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে ।

রাজরক্তপাতের পূর্বমুহূর্তে গোবিন্দমাণিক্য যখন রঘুপতির ছলনা ধরাইয়া দিল তখন যেন জয়সিংহের পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেল। তাহার পর জীবনবিসর্জন ছাড়া গত্যন্তর রহিল না ।

দেবীর নিষ্ঠাবান সেবক রঘুপতি। আচারনিষ্ঠ শাস্ত্রে তাহার অপরিসীম আস্থা । ব্রাহ্মণের অধিকার সম্বন্ধে তাহার বোধ অত্যন্ত সচেতন। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে দেবী পূজাই তাহার জীবনের একমাত্র কর্তব্য। হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন করিবার কোন সুযোগ সে পায় নাই। তদুপরি অন্ধ কর্তব্যের শুষ্ক কঠিন পথ অনুসরণ করিতে করিতে তাহার হৃদয়ের উৎস শুকাইয়া গিয়াছিল। জয়সিংহের উপর তাহার স্নেহ দেবীপূজার ফাঁকে ফাঁকে বাড়িয়া উঠিলেও জয়সিংহকে সে দেবীর ভক্ত-সেবক এবং আপনার অনুরক্ত পুত্র-শিষ্য বলিয়াই জানে। কর্তব্যের পাষাণচাপা খন্ড স্রোত এই স্নেহের যে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা ও মূল্য আছে, একথা ভাবিবার কোন অবসর সে পায় নাই । মানবের বৃহত্তর কর্তব্যবোধ যে দেবীপূজার প্রচলিত বিধিকে উল্লঙ্ঘনে করিতে পার এ ধারণা তাহার পক্ষে অভাবনীয়। দেবতার অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অর্থ ব্রাহ্মণের অধিকার হরণ,-ইহাই তাহার ধারণা। এই বিশ্বাস ও নিষ্ঠা রঘুপতি-চরিত্রের মেরুদন্ড। দেবীপূজায় জীববলি নিষিদ্ধ হইলে রঘুপতি রাজাকে বলিয়াছিল, "শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে! " গোবিন্দমাণিক্য শাস্ত্রের উপরে দেবীর আদেশের-অর্থাৎ তাহার দেবী উপলব্ধির-দোহাই দিলে রঘুপতি যাহা বলিয়াছিল আসলে তাহা নিজের বেলাই খাটে ।

একে ভ্রান্তি,তাহে অহংকার! অজ্ঞ নর,
তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই,

গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে রঘুপতির দ্বন্দ্ব এক হিসাবে ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ শক্তির দ্বন্দ্ব বলা যাইতে পারে,অন্তত রঘুপতির দিক দিয়া ।

বাহুবল রাহুসম
ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়—সিংহাসন
তোলে শির যজ্ঞবেদী পরে?

গুণবতীও তাই বুঝিয়াছে,

সেইমত আজ্ঞা
কর নাথ ! ব্রাহ্মণ ফিরিয়া পাক নিজ
অধিকার, দেবী নিজ পূজা,

গোবিন্দমাণিক্যের উপর রঘুপতির গূঢ় কারণ ঈর্ষা, তা তাহার নিজেরও অজ্ঞাত। গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি জয়সিংহের আন্তরিক প্রীতি-ভক্তি আত্ম-সর্বস্ব রঘুপতি ভালোচোখে দেখে নাই। জয়সিংহ তাহার একমাত্র অবলম্বন, জয়সিংহের হৃদয়বৃত্তির অংশমাত্রও অপরে পাইবে এ কল্পনা তাহার অসহ্য। এই কারণেই অপর্ণাও রঘুপতির বিষনেত্রে পড়িয়াছিল । অপর্ণা নারী, তাই ব্রাহ্মণের অন্তরের এই গূঢ়রহস্য তাহার অজ্ঞাত থাকে নাই । যে-বন্ধন ধীরে ধীরে শ্লথ হইয়া আসিতেছিল সে-বন্ধনের বেদনা রঘুপতির চিত্তে জাগিয়া উঠিল প্রথমে অপর্ণার শাপে। মর্মের গোপন স্থানে ঘা পড়ায় ব্রাহ্মণেরও হৃদয়ের কঠিন কপাট ক্ষণেকের জন্য উন্মুক্ত হইল।

আমি আজন্মের বন্ধু, দুদন্ডের
মায়াপাশ ছিন্ন হয়ে যায় যদি, তাহে
এত ক্লেশ !

রঘুপতির মর্মঘাত হইতেছে –

জয়সিংহ, কিছুতে পাইনে তোর মন
এত যে সাধনা করি নানা ছলে বলে !

রঘুপতি ক্ষমতাপ্রিয় প্রতিমাপূজক, প্রতারক নয়। নিজের কাছে সে খাঁটি । সে সত্যকে দেখিতে চায় নিজের বুদ্ধির দৃষ্টিতে। এই দৃষ্টি শাস্ত্রের অনুশাসনে সংকীর্ণপ্রসর এবং সংস্কারের আবরণে ক্ষীণ । তাই দেশকালাতীত সহজ সত্যকে গ্রহণ করিতে সে অক্ষম । দেবীপ্রতিমার সাহায্যে প্রতারণাময় অভিনয় রঘুপতির কাছে মিথ্যাচার নয় পাপও নয় । তাহার বিশ্বাস

দেবতার অসন্তোষ
প্রতিমার মুখে প্রকাশ না পায় । কিন্তু
মুর্খদের কেমনে বুঝাব ? চোখে চাহে
দেখিবারে,চোখে যাহা দেখিবার নয় ।
মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই ।
মুর্খ! তোমার আমার হাতে সত্য নাই।

অনতিবিলম্বেই অপর্ণার শাপের বীজ অঙ্কুরিত হইল । রঘুপতির অবচেতন মনে জয়সিংহের ভাবী বিরহ গাঢ় ছায়া ফেলিল, তাই উদভ্রান্ত মনে ক্ষণে ক্ষণে জয়সিংহের বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। রঘুপতির মনের হিমশিলা যে গলিতে শুরু করিয়াছে তাহা জানা গেল নিদ্রিত ধ্রুবকে দেখিয়া তাহার স্বগতোক্তিতে ।

ওরে দেখে
তার সেই শিশুমুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে ।

রাজার কাছে নতিস্বীকারের হীনতাজ্বালায় রঘুপতি জয়সিংহের স্নেহের দোহাই দিয়া নাটকের ক্লাইমাকসের সূচনা করিল । স্নেহের দাবি করিয়া সে স্নেহাস্পদেরই মৃত্যুবাণ হানিল ।

কোলে এসেছিল
যবে, ছিল এতটুকু, এ জানুর চেয়ে
ছোট, তার কাছে নত হোক জানু ! পুত্র
ভিক্ষা চাই আমি!

জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতির অন্তরের অহংকার-অভিমানের প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িল। তখন জয়সিংহের প্রেমই মধ্যস্থ হইয়া রঘুপতি-অপর্ণার বিরোধের অবসান ঘটাইয়া দুই বিরহিহৃদয়কে স্নেহের নিবিড় বন্ধনে বাঁধিয়া দিল। জয়সিংহ মরিয়া গিয়া রঘুপতির অন্তর অধিকার করিয়া বসিল, আর অপর্ণা তাহার অসম্পন্ন কর্তব্যভার তুলিয়া লইল ।

অপর্ণার ভুমিকা রাজর্ষিতে নাই , ইহা বিসর্জনে নূতন সৃষ্টি। জয়সিংহের হৃদয়বৃত্তির উদ্বোধনের জন্য এই ভুমিকাটি আবশ্যক। বাৎসল্যকারুণ্যের বন্ধন এই দুই মাতৃহারা কিশোরহৃদয়কে নিতান্ত স্বাভাবিক ও অনিবার্যভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। জয়সিংহের সদয় ব্যবহার ও অবুঝ ব্যবধান অপর্ণাকে নাড়া দিয়া তাহার প্রেম জাগ্রত করিল এবং কল্যাণময় পরিণতির দিকে চালাইল।

যেথা যাই শুধু দয়া
গৃহ আর নেই, শুধু দীর্ঘ রাজপথ।
তবে ভিক্ষা ভাল! জয়সিংহ,
আমি তব তরুলতা নহি। আমি নারী।

জয়সিংহের অন্তর্বেদনা যখন অপর্ণা বুঝিতে পারিল তখন সে তাহার নারী হৃদয়ের মান-অভিমান ভাসাইয়া দিয়া রঘুপতির আদেশ ও জয়সিংহের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। জয়সিংহের নিষ্ঠুর উত্তরে ক্ষুব্ধ না হইয়া অপর্ণা চক্রী রঘুপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া অন্তরের জ্বালাটুকু বাহির করিয়া দিল।

আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে,এ-বন্ধনে
জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে।

মন্দিরে যে আসন্ন ট্রাজেডি ঘনাইয়া উঠিতেছে তাহা অপর্ণা অনুভব করিয়া কেবলি ব্যাকুলভাবে জয়সিংহকে ডাকিতে লাগিল।

এই বেলা এস,
জয়সিংহ, এস মোরা এ মন্দির ছেড়ে
যাই!

কিন্তু জয়সিংহের যাইবার স্থান কোথায় । যে রাজত্বে সে আজন্ম বাস করিয়াছে তাহার খাজনা শোধ না করিয়া যাইবার যো নাই।

শ্রাবণের সেই শেষ রজনীতে বহিঃপ্রকৃতির মতো অপর্ণার চিত্তও ব্যাকুল, উদভ্রান্ত। জয়সিংহর অন্বেষণে সে যখন মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার পূর্ব মুহূর্তে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে, আর রঘুপতি জয়সিংহের দেহের উপরে পড়িয়া বিলাপ

করিতেছে । শুষ্কচিত্ত রুক্ষমূর্তি ব্রাহ্মণের অন্তরের এই অমৃত-উৎস অপর্ণার হৃদয়স্পর্শ করিল । মুহূর্তে জয়সিংহের উত্তরাধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া অপর্ণা তাহার স্নেহসুধা সব টুকু ঢাকিয়া বলিল, "পিতা ,চলে এস " ।

নাটকের ধ্রুব চরিত্র রাজা গোবিন্দমাণিক্য! তাঁহার মনে কোন দ্বন্দ্ব কোন সংশয় নাই। শাস্ত্র জ্ঞানের মধ্য দিয়া নয়, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির সাহায্যেও নয় , আপন নির্মল অন্তরের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্য সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাই তাহার হৃদয়ে সংশয়ের লেশ নাই। তাহার কতর্ব্যের পথ কঠিন হইলেও পরিষ্কার। ক্ষোভ শুধু এই,

হায় মহারাণী, কর্তব্য কঠিন হয়ে
ওঠে-তোমরা ফিরালে মুখ ।

ক্ষুব্ধ প্রেম যদি পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় সে বড় মর্মান্তিক । গোবিন্দমাণিক্যের ট্রাজেডি তাহাই ।

রাজমহিষী গুণবতীর হৃদয়দ্বন্দ্ব একটু জটিল হইলেও বেশ স্বাভাবিক। রঘুপতির ও গুণবতীর সমস্যার মধ্যে মিল আছে । উভয়েই অধিকারলোপের অভিমানে ক্ষুব্ধ এবং উভয়েই স্নেহপাত্রের সম্পূর্ণ অধিকার দাবি করে । সন্তানহীনতার আত্মধিক্কার গুণবতীকে মনে মনে রাজার কাছে দোষী কবিয়া রাখিয়াছিল। হাসির ও ধ্রুবের প্রতি রাজার অহেতুক বাৎসল্যপ্রীতি এই হীনতাবোধের উপর ঈর্ষার উস্কানি দিয়াছিল ।

মাতঃ কোন্ পাপে মোরে
করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হতে ?
রাজহৃদয়ের সুধাপাত্র হতে,তোরা
নিলি প্রথম অঞ্জলি, কে তোরা পথের ছেলে ।

তৃতীয়ত দেবীপুজায় বলিনিষেধে সংস্কারে আঘাত এবং রঘুপতির ভীতিপ্রদর্শন ও সূক্ষ্ম চাটুবাণী ।

দেবতা কৃতার্থ
হল তোমারি আদেশ বলে,ফিরে পেলে
ব্রাহ্মণ আপন তেজ! তোমরাই ধন্য
এ যুগে যত দিন নাহি জাগে কল্কি
-অবতার!

স্বামী-স্ত্রী বিরোধ এখন কঠিন রূপ ধরিল । স্বামীর কাছে রাজাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতে গিয়া যখন প্রত্যাখ্যাত হইল তখন গুণবতীর অভিমানের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। রাজা-ও-রাণীর মতো বির্সজনেও স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ রাজকর্তব্য উপলক্ষ্য করিয়া । রাণীর পূজা দ্বিতীয় বার ফিরাইয়া দেওয়ার অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল।

মহামায়া তুই নারী
আমি নারী-দে আমারে তোর শক্তি-অংশ
স্নেহ মায়া দয়া ধরুক সংহারমূর্তি ।

এই বজ্রকঠিন অভিমান-অহংকারের মধ্যেও প্রেমের প্রতীক্ষা জাগিয়াছিল। তাই বিরোধের প্রত্যক্ষ হেতু দেবীমূর্তি অপসারণের পর স্বামী-স্ত্রীর মিলন অতিসহজেই ঘটিয়া গেল ।

(বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড)

রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'

নীহাররঞ্জন রায়

'বিসর্জন' আমাদের ধর্মের একটা অর্থবিহীন নিষ্ঠুর সংস্কার ও আচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, আর এই প্রতিবাদ প্রথম দেখা দিয়াছে একটি বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে এবং সেই প্রতিবাদকে ভাষা দিয়াছেন গোবিন্দমাণিক্য। নাটকটির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত চিরাচরিত প্রথার সঙ্গে এই সংগ্রাম সর্বত্র মুখর হইয়া আছে, জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তাহার বিরাম নাই। এই সংগ্রাম আরও জীবন্ত হইয়াছে ব্রাহ্মণ রঘুপতির চরিত্রে; তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস যেন আগুন হইয়া তাঁহার কথার মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এই দুই বিরোধী সমস্যাই নাটকের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বকে আগাগোড়া জাগাইয়া রাখিয়া উহাকে স্পন্দিত ও জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। কি মনের, কি বাহিরের, এতখানি দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের আর কোন নাট্যেই এমন জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠে নাই, এই হিসাবে 'বিসর্জন' অতুলনীয়। জয়সিংহের মনের মধ্যে যে সংশয়ের নিষ্করুণ দ্বন্দ্ব, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব চরিত্র-বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, খুব কম নাট্যেই তাহার তুলনা আছে। আর কি জয়সিংহ, কি রঘুপতি, কি গোবিন্দমাণিক্য,কি অপর্ণা, ইহাদের মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম তাহা মনের মধ্যেই শুধু লীলায়িত হয় নাই, বাহিরের কথার গতিভঙ্গি ও কর্মের মধ্যেও তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। চিত্তের ও কর্মের দ্বন্দ্বগতির এমন অপূর্ব সমন্বয় রবীন্দ্রনাথের আর কোনও নাটকেই এতটা সম্ভব হয় নাই। 'বিসর্জন' যে অভিনয়-সাফল্য লাভ করিয়াছে, ইহাই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ।

ভাববিকাশের দিক হইতেও 'বিসর্জন' প্রতিমুহূর্তে লীলা-চঞ্চলিত। প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্রেই একটা সংশয়ের চঞ্চলতা, একটা সংগ্রামের ক্ষুব্ধতা যেন দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে। এই সংশয় ও সংগ্রাম সকলের চেয়ে প্রবল জয়সিংহের চরিত্রে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই এই সংশয় প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে, এবং সে সংশয়কে জাগাইয়াছে অর্পণা—

আজন্ম পূজিনু তোরে, তবু তোর মায়া
বুঝিতে পারিনে। করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের দয়া নাই বিশ্বজননীর।

এই যে সংশয় জাগিল এর নিবৃত্তি আর কোথাও হইল না, হইল শুধু মৃত্যুর মধ্যে। জয়সিংহের জীবনের সমস্তগুলি দিন তাহার শুধু নিষ্করুণ দ্বিধা সংশয়ের মধ্যে কাটিল, চিত্ত শতধা দীর্ণ হইল, প্রেমের মধ্যে শান্তির মধ্যে প্রতি মুহূর্তে আশ্রয় খুঁজিয়া খুঁজিয়া বার বার তাহাকে গুরুর আদেশে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। অর্পণা তাহাকে প্রতিদিন মুক্ত জীবনের প্রেম ও শান্তির মধ্যে টানিতে চাহিল, আর প্রতিদিন ভালবাসিতে

চাহিয়াও নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া কাঁদিয়া মরিল। গুরুর ইচ্ছার পদতলে, তুচ্ছ আচার ও সংস্কারের যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দিতে হইল। এমন সংশয়-নিপীড়িত আপাত-ব্যর্থ জীবন কাহার! এমন করিয়া নিজে মৃত্যুকে বরণ করিয়া পরকে জীবনের সন্ধান দিয়া যায় কে? অথচ নিজের জীবনের সংশয় শেষ পর্যন্ত তাহার ঘুচিল না। শেষ পর্যন্ত একটা বিরাট শূন্যতার মধ্যেই তাহাকে জীবন বিসর্জন করিতে হইল। মন্দিরের দেবী কি সত্য, না অন্তরের বিশ্বাস সত্য; গুরুর আদেশ বড়, না প্রেমের আহ্বান বড়; সংস্কার বড়, না হৃদয় বড়? অর্পণা তাহাকে শিখাইয়াছে, অন্তরের বিশ্বাসই সত্য, প্রেমের আহ্বানই বড়, হৃদয়ের নির্দেশই অমোঘ; কিন্তু পিছন হইতে টানিয়াছে মন্দিরের দেবী আজন্মের সংস্কার, গুরুর আদেশ, এবং শেষ পর্যন্ত ইহাদেরই নিষ্করুণ বিধানের নীচে তাহাকে আত্মবিসর্জন করিতে হইয়াছে। এমন শূন্যতার মধ্যে এমন একটা জীবনের বিসর্জন, ইহাই সমগ্র নাটকটিকে একটি বিরাট শূন্য ব্যর্থতায় একটি নিষ্করুণ বেদনার ভারে ক্ষুব্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

দেবী, আছ, আছ তুমি! দেবি, থাক তুমি।
এ অসীম রজনীর সর্বপ্রান্তশেষে
যদি থাক কণামাত্র হয়ে, সেথা হতে
ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বলো মোরে,
'বৎস আছি'।—নাই, নাই, নাই, দেবী নাই।
নাই? দয়া করে থাকো, অয়ি মায়াময়ি
মিথ্যা, দয়া কর, দয়া কর জয়সিংহে,
সত্য হয়ে ওঠ। আশৈশব ভক্তি মোর
আজন্মের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে?
এত মিথ্যা তুই?

এই যে আক্ষেপ, কোনও সান্ত্বনা আছে, না ইহার বেদনার কোনও সীমা আছে? কিন্তু সত্যই কি তাহার জীবন ব্যর্থ, সত্যই কি তাহার আত্মদান মানুষকে কোনও মহত্তর সত্যের দিকে ইঙ্গিত করিয়া যায় নাই। এত বড় বিসর্জন কি মানুষের অন্ধকার চিত্তপুরীতে একটি কক্ষও আলোকিত করে নাই!

করিয়াছে, রঘুপতিকে সে জীবনের সন্ধান দিয়া গিয়াছে; মানুষের একটা অন্ধ আচার ও সংস্কারকে চূর্ণ করিয়া তাহাকে সত্যের জ্যোতির্ময় আলোকরেখার দিকে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছে। রঘুপতি নিষ্করুণ, কিন্তু রঘুপতি ক্রূর, কুটিল নহে; তাহার বিশ্বাস ভুল হইতে পারে, কিন্তু সে নিজেকে বঞ্চনা করে নাই, সত্যই সে বিশ্বাস করে দেবী চাহেন বলি, জীবরক্ত ছাড়া তাঁহার তৃষ্ণা মিটে না। ইহাই আজন্মের সংস্কার, এই সংস্কারের জালের মধ্যে নিজেকে বন্দী রাখিয়াই সে তাহার সার্থকতা লাভ করিতে চাহিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যের গর্ব তাহার প্রদীপ্ত, তাহার অপমান, তাহার ক্ষমতার হ্রাস তিলমাত্রও সে সহিবে না; নিজের ও দেশের চিরাচরিত আচার ও সংস্কারকে কিছুতেই

সে ক্ষুণ্ন হইতে দিবে না, যত কঠোর হউক রাজার আদেশ। তাহার বিরুদ্ধে যে উপায়, যে চক্রান্তই তাহাকে অবলম্বন করিতে হয়, সে তাহা করিবেই, কর্তব্যবিচ্যুতি সে কিছুতেই ঘটিতে দিবে না।

আমি আছি যেথা, সেথা এলে
রাজদন্ড খসে যায় রাজহস্ত হতে
মুকুট ধূলায় পড়ে লুটে।

এমন প্রচন্ড তাহার গর্ব। এই গর্বই তাহাকে রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবার যুক্তি দেয়, এই গর্বই জয়সিংহকে বার বার বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিয়া রাজরক্ত আনিতে পাঠায়। এই গর্বই তাহার মানব-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-প্রীতি দয়া মায়া ভালবাসাকে উৎখাত করিয়া সমগ্র জীবনটাকে শুধু একটা ধূ ধূ করা ভয়াল তৃষ্ণার্ত মরুভূমি করিয়া তোলে। পাপ কি, পুণ্য কি সে তাহা ভালই জানে; সত্য কি,মিথ্যা কি তাহাও তাহার অজ্ঞাত নয়, কিন্তু আত্মাভিমানের কাছে সব খর্ব হইয়া যায়, সত্য মিথ্যা হইয়া যায়, মিথ্যা সত্যের মুখোস পরিয়া উপস্থিত হয়, পাপপূণ্যের ভেদাভেদ চলিয়া যায়,শুধু জাগিয়া থাকে প্রচন্ড প্রদীপ্ত নিষ্করুণ অহং। কিন্তু দ্বন্দ্ব কি তাহার চিত্তেও নাই? আছে, এই নিষ্করুণ হৃদয়ের এক কোণে একটু স্নেহের উৎস আছে। জয়সিংহকে সত্যই রঘুপতি ভালবাসে, তাহা হারাইবার চিন্তাও সে সহিতে পারে না, অর্পনা তাহার প্রেমে জয়সিংহকে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে, ইহা তাহার অসহ্য।

সত্য করে বলি বৎস তবে। তোরে আমি
ভালবাসি প্রাণের অধিক—পালিয়াছি
শিশুকাল হতে তোরে, মায়ের অধিক
স্নেহে, তোরে আমি নারিব হারাতে।

ইহা রঘুপতির ছলনা নয়। সত্যই রঘুপতি জয়সিংহকে ভালবাসে। কিন্তু সে ভালবাসাও যে আত্মাভিমানেরই তৃপ্তি! কিন্তু এই যে আত্মাভিমান, এই যে প্রচন্ড গর্ব, ইহাকে চূর্ণ করিয়া ধূলায় লুটাইতে না পারিলে যে রঘুপতির মুক্তি নাই, জীবনের রহস্য, ধর্মের রহস্য যে সে জানিল না। এ অভিমান চূর্ণ করিল তাহারই স্নেহের পুত্তলি জয়সিংহ, তাহারই নিষ্ঠুর গর্বিত অন্ধ উন্মত্ত খেয়ালের চরণে নিজেকে বিসর্জন দিয়া; আর জীবনের রহস্য, ধর্মের রহস্য জানাইল অর্পণা, তাহার বালিকা-হৃদয়ের সহ দ্বিধাহীন প্রেম ও বিশ্বাসের মধ্যে তাহাকে আশ্রয় দান করিয়া।

কিন্তু রঘুপতির চরিত্রের শেষ পরিণতি যেন একটু অকস্মাৎ ঘটিয়াছে এবং তাহার পূর্বাপর দৃপ্ত অনম্য চরিত্রের সঙ্গতিকে যেন একটু ক্ষুণ্ন করিয়াছে। পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের পর রঘুপতির পরিচয় যদি আমরা পাইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় এই অসঙ্গতিটুকু আমাদের চোখে পড়িত না। সেখানে আছে, 'বৎস মোর গুরুবৎসল! ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর কিছু নাই চাই; অহংকার অভিমান দেবতা ব্রাহ্মণ সব

যাক। তুই আয়।' সেইখানেই যদি রঘুপতির পরিচয়ের সমাপ্তি ঘটিত তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম, তাহার জীবনের রুদ্ধ অমাবস্যা-রাত্রির অবসান হইয়াছে, শান্ত উষার অরুণোদয়ের আর বাকী নাই; নাটকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু পঞ্চমাঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে তাহার যে পরিচয় আমরা পাই তাহাতে মনে হয়, যেন সমগ্র জীবনের একান্ত পরাজয়ের মধ্যে তাহার চরিত্রের তেজোদৃপ্ত গর্ভটুকু একেবারে ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে, মনে হয় যেন নিজের কাছেই নিজে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। অথচ এই দুর্বলতা তাহার চরিত্রের নিজস্ব বস্তু নহে। কিন্তু এই বিশ্লেষণ যথার্থ কিনা তাহা পরে একটু বিচার করিয়া দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন হইবে।

গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র এত শান্ত ও স্তব্ধ, এত স্থির ও অচঞ্চল লীলার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে সহসা তাহা আমাদের অনুভূতিকে স্পন্দিত করে না,—জয়সিংহ, রঘুপতি ও অপর্ণাই আমাদের সমস্ত বোধ ও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া রাখে। তাহার কারণও আছে। গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র মহৎ, কিন্তু বিকাশের দিক হইতে তাহা সুন্দর নহে; তাহার মধ্যে কোন দ্বিধা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, সংশয় নাই। প্রতি মুহূর্তের অনুভবের নতুনত্বের মধ্যে যে রসের লীলা, মনের মধ্যে সংশয়ের যে দোলা, গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে তাহা নাই। ঘটনা সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সে আপনাকে বিকশিত করিয়া চলে না; তাঁহার চরিত্রের মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ নাই।

অপর্ণার চরিত্রের মধ্যেও যে এই সৃষ্টির আনন্দ খুব আছে তাহা নয়, সে চরিত্রের মধ্যেও খুব কিছু দ্বন্দ্বের লীলা নাই। সংশয়ের খুব দোলা নাই, কিন্তু তাহা না থাকিলেও অর্পণার চরিত্রে রসের একটা লীলা আপন মাধুর্যে আপনি স্পন্দিত হইয়া আছে; সে-লীলা সে-রহস্য সকল অবস্থাতেই সুন্দর। অথচ তাহার জীবনের কোন বিকাশ নাই, ধীরে ধীরে সে আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে না। অপর্ণাকে প্রথম আমরা যখন দেখি, তখন সে শুধু একটি সরলা বালিকা মূর্তি ধরিয়াই আমাদের সম্মুখে দাঁড়ায়; পরে অবশ্য ধীরে ধীরে তাহার মধ্যে জয়সিংহের প্রতি একটা স্নেহ ও প্রেমাকর্ষণের ভাব ফুটিয়া উঠে এবং সর্বশেষে জয়সিংহের বিসর্জন দৃশ্যে তাহা আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু অপর্ণার চরিত্রে ধীরে ধীরে এই যে পরিবর্তন, এ যেন জীবনের কোনও বিকাশ নয়, যেন তাহার সরল বালিকামূর্তিরই আর একটা দিক মাত্র সরল দ্বিধাবিহীন একটি প্রেমানুভূতির ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে, যেন সে যাহা ছিল শেষ পর্যন্ত তাহাই রহিয়া গেল। মনে হয় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মা; তাহার দলগুলি একটি একটি করিয়া বিকশিত হয় নাই, একটি একটি করিয়া ঝরিয়া পড়ে নাই। অপর্ণা বিচলিত করে, নিজে বিচলিত হয় না, হইলেও পরক্ষণেই নিজের সংবিৎ নিজেই ফিরিয়া পায়। না পাইবেই বা না কেন—সে যে একটি শাশ্বত সত্য, যাহার গন্ধ মধুর, যাহার স্পর্শ কোমল, যাহার রূপ সুন্দর, যাহার কোনও জন্ম নাই, বিকৃতি নাই, মৃত্যু নাই; একটি অবিকৃত সহজ সরল সত্যের যে রহস্যমূর্তি বালিকার রূপ ধরিয়া স্নেহের ও প্রেমের শান্ত স্নিগ্ধ রাজ্যের মধ্যে জয়সিংহকে, সকল সংশয়াকুল মানুষকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া

আনিতে চাহিতেছে। অর্পণা একটি আইডিয়ার রসমূর্তি, কোনও জীবনের বিকাশ নয়, রক্তমাংসের একটি মানবকন্যার রূপ তাহার মধ্যে কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই। যদি একটি জীবনই হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার বিচিত্র বিকাশ কোথায়, তাহার উদয় কোথায়, অস্ত কোথায়, তাহার দুঃখের বেদনা কোথায়, সুখের অনুভূতি কোথায়, চিত্তের বিকাশ কোথায়, অন্তরের চঞ্চলতা কোথায়? সে জয়সিংহকে ভালবাসে, তাহার সংশয় ও বেদনায় বিচলিত হয় সেখানে শুধু সে সত্যের প্রকাশকেই আরও জীবন্ত, আরও রহস্যময় করিয়া তোলে, সত্য যে কোনও জড় নিশ্চল পদার্থ নয়, সে জীবন্ত ও নিত্য স্পন্দমান এই কথাই সপ্রমাণ করে। রঘুপতি কোনও সত্যের প্রতিমূর্তি নয়, সে একটা জীবন যাহা নানান ঘটনার ভিতর দিয়া আবর্তিত ও বিকশিত হইতেছে। জয়সিংহও কোন বিশিষ্ট সত্যকে রূপায়িত করে না,সে নিজের জীবনকেই নানান সংশয়ের ভিতর দিয়া পরিণতির দিকে লইয়া চলে। কিন্তু আপনার চরিত্র ঠিক বিপরীত। সে তাহার নিজের জীবনকে বিকশিত করে না, কোন পরিণতির দিকে চালনা করে না, একটি 'আইডিয়াকেই' উদ্‌ঘাটিত করিতে সাহায্য করে, সে সত্যেরই অস্পষ্ট মূর্তি গ্রহণ করিয়া দাঁড়ায়, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া নাটকের সত্যটি ফুটিয়া উঠে।

পঞ্চমাঙ্কে প্রথম দৃশ্যের পর রঘুপতি-চরিত্রের আর কোন পরিচয় যদি আমরা না পাইতাম তাহা হইলে হয়ত ভাল হইত। একথা বলিবার পক্ষে কি যুক্তি আছে তাহা ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে প্রথমেই মনে হয়, তাহা হইলে রঘুপতির চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষা পাইত এবং আমাদের কাছে রঘুপতি আরও জীবন্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিত। জয়সিংহ যেখানে একটি নিষ্ঠুর বিধানের নিছে আত্মদান করিল, যেখানে এক মুহূর্তে স্নেহের গোপন কোণটিতে প্রচন্ড বেদনার আগাত লাগিয়া রঘুপতির চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, সেখানে একান্ত প্রিয় জয়সিংহকে হারাইয়া অর্পণাও কিছুতেই নিজকে অবিচলিত রাখিতে পারিল না, সেইখানেই যদি নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটিত, তাহা হইলে অভিনয় হিসাবে 'বিসর্জনে'র রস-মাধুর্য আরও নিবিড় হইতে পারিত। শুধু ঘটনা বস্তুর বিকাশের দিক হইতে দেখিতে গেলেও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ইহার পর রঘুপতি অথবা অর্পণা, গোবিন্দমাণিক্য অথবা গুণবতী কাহার কি হইল, ঘটনা স্রোত কোন পথে চলিল, যে সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য গোবিন্দমাণিক্য বুঝিয়াছিলেন, সে-সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল কি-না, যে-সংশয়ের জন্য জয়সিংহ প্রাণ দিল সে-সংশয় ঘুচিল কিনা, এসব জানিবার ঔৎসুক্য পাঠক অথবা দর্শকের থাকে না; জয়সিংহের বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাবস্তুর প্রতি তাহার মনোযোগ ও আকর্ষণ শিথিল হইয়া যায়। অপর্ণার চরিত্র যে একটা 'আইডিয়া'র রূপক হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার জন্য এই উপসংহার দৃশ্যটি কতটা দায়ী। যেখানে জয়সিংহের মৃত রুধিরাক্ত দেহ দেখিয়া প্রতিমার চরণে আছড়াইয়া পড়িয়া অপর্ণা চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ফিরে দে! ফিরে দে! ফিরে দে!' সেইখানেই যদি অপর্ণা চরিত্রের পরিচয় শেষ হইত, তাহা হইলে অপর্ণার মধ্যে আমরা স্পন্দনমান মানবচিত্তের, সর্বোপরি তাহার নারী-হৃদয়ের সত্য রূপটি দেখিতে পাইতাম, এবং সেইরূপেই সে আমাদের চিত্তের রসবোধকে বেশি তৃপ্ত করিত এবং তাহার ঐ পরিচয়ই আমাদের মনের উপর চিরকালের জন্য দাগ কাটিয়া যাইত। কিন্তু শেষ দৃশ্যে

সে আসিয়া যখন দাঁড়াইল তখন তাহার মধ্যে সেই মানব-হৃদয়ের বাস্তব রূপটি আর নাই, তখন সে এত শান্ত,এত স্থির যেন তাহার উপর দিয়া কোনও ঝড়ই বহিয়া যায় নাই, যেন তাহার চিত্তের কোন বিকারই কোন কালে হয় নাই, সে যাহা ছিল তাহাই যেন সে রহিয়া গেল। তাহার মুখের কথা কয়টিও খুব লক্ষ্য করিবার; বার দুই তিন সে শুধু বলিল, 'পিতা চলে এস! পিতা, এস এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা', যেন এই কথা কয়টির ভিতর দিয়া এই মর্মটি ব্যক্ত হইল যে, সে যে-সত্যের রহস্যমূর্তি সেই সত্যটাকেই শেষ পর্যন্ত সেই জয়ী করিয়া লইল, কিছুই তাহাকে বিকৃত ও বিচলিত করিতে পারিল না; সেই সত্যের আহবানই রঘুপতিকে দেবীহীন মন্দির হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল! যেন বালিকা অপর্ণাকেই নয়, যেন সত্যের রহস্যমূর্তি অপর্ণাই সব। ইহার ফলে আর একটা জিনিসও একটু বড় হইয়া উঠিয়াছে। একথা সকলেই জানেন যে, 'বিসর্জনে'র মধ্যে একটা প্রত্যয় খুব নিবিড় হইয়া আছে, সমস্ত নাটকটিতে সেই প্রত্যয়টিকে কেন্দ্র করিয়াই যত কিছু সংগ্রাম। পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি নাটকটির উপর যবনিকাপাত হইত, তাহা হইলে সংগ্রামের শেষে সেই প্রত্যয়টিই জয়ী হইল কিনা সে খবর আমরা পাইতাম না। কিন্তু শেষ দৃশ্যগুলিতে দেখিলাম, সেই প্রত্যয়টিই সম্পূর্ণ বিজয়োৎসব। একটা নির্দিষ্ট সত্যপ্রতিষ্ঠার, একটা নির্দিষ্ট প্রত্যয়ের জয়-প্রদর্শনের এই যে, প্রয়াস, ইহা 'বিসর্জনে'র রসবোধ ও অনুভূতির তীব্রতাকে একটু ক্ষুণ্ন না করিয়া পারে নাই; এবং সেই নির্দিষ্ট সত্যটাই যে কবির মনকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল তাহাও কতকটা ধরা না পড়িয়া পারে নাই।

কিন্তু, এই ধরনের বিচারের বিরুদ্ধে কিছু যুক্তিও আছে। প্রথমেই কথা হইতেছে, পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অর্থাৎ জয়সিংহের বিসর্জন দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে রঘুপতির চরিত্রের পরিচয় শেষ হইতে পারে কি? তাহা হইলে রঘুপতি চরিত্রের চরম পরিণতিটুকু বুঝিতে পারা যায় কি? তাহার ব্রাহ্মণ্যের দৃপ্তগর্ব হঠাৎ বাধা পাইয়া যে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় নিজেকে একেবারে অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই দৃপ্ত গর্ব মাটির ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া চরম ব্যর্থতায় আত্মপ্রকাশ না করিলে রঘুপতির সবটুকু পরিচয় যেন কিছুতেই সম্পূর্ণ হয় না, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নাটকটি যে-পথে যাত্রা শুরু করিয়াছিল তাহাও একটা যুক্তিসহ পরিণতিতে আসিয়া পৌঁছায় না। রঘুপতির দৃপ্ত গর্বিত চরিত্র যে প্রচন্ড বেদনার আঘাতে একেবারে সকল দর্প গর্ব হারাইয়া সকল অহংকার অভিমান জলাঞ্জলি দিয়া একান্ত দুর্বল অসহায়তার মধ্যে আপন সংবিৎ ফিরিয়া পাইয়াছিল, এবং ধর্মের রহস্যকে জানিয়াছিল, তাহার আগেকার চরিত্রের ছায়াটুকুও যে থাকে নাই, ইহা হয়ত কিছু অস্বাভাবিক নয়। এই ধরনের জীবনে যেন এইরকম পরিণতিই দেখা গিয়া থাকে। একটা অহংকারকে আশ্রয় করিয়া যখন কাহারও সমস্ত কর্ম ও চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই অহংকারের মধ্যেই সে যখন একেবারে ডুবিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই সমস্ত রস পানীয় সংগ্রহ করে, বেদনার আঘাত লাগিয়া তাহা যখন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহার আর আশ্রয় কিছু থাকে না, তাহার রস ও পানীয়ের উৎস শুকাইয়া যায়, এবং সেই অবস্থায় সে একান্ত নিঃস্ব ও অসহায় দুর্বলতার মধ্যে নিজের স্বরূপটিকে জানিতে পারে। মানুষের চিত্তধর্মের ইহাই স্বাভাবিক গতি। কিন্তু রঘুপতির চরিত্র যে জয়সিংহের বিসর্জন দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইতে পারে না,

ইহাই হয়ত তাহার একমাত্র কারণ নহে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, জয়সিংহের চরিত্রই বুঝি সকলের অপেক্ষা করুণ-রসাত্মক এবং তাহার বিসর্জন দৃশ্যের মধ্যেই বুঝি নাটকের সমস্ত ট্রাজেডিটুকু নিহিত রহিয়াছে। সেইজন্যই তাহার বিসর্জন দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে রঘুপতি-চরিত্রের অবসান ঘটিলেই নাটকের ট্রাজেডিটুকু ভাল করিয়া ফুটিতে পারিত, এই ধারণা জন্মায়। জয়সিংহের আত্মদানের ট্রাজেডি খুব দৃশ্যময়, সেইহেতু আপাতদৃষ্টিতে এরূপ মনে হওয়া খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে, নাটকের ট্রাজেডিটুকু জয়সিংহ চরিত্রের মধ্যে ততটা নয়, যতটা রঘুপতির চরিত্রের মধ্যে; বস্তুত জয়সিংহ চরিত্র অপেক্ষাও গভীরতর ট্রাজেডি নিহিত রহিয়াছে রঘুপতি-চরিত্রে এবং সেই ট্রাজেডির বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে জয়সিংহের আত্মদানের পরমুহূর্ত হইতে। সে-মুহূর্তের পূর্ব পর্যন্তও রঘুপতির একটা ঐশ্বর্য ছিল, একটা সুবৃহৎ গর্ব ছিল, তাহা তাহার বুদ্ধির অহঙ্কার, যুক্তির অহংকার, বিশ্বাসের অহংকার, ক্ষমতার অহংকার; এই অহংকারই তাহার সমস্ত সত্তাটাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু জয়সিংহ যে মুহূর্তেই তাহার অহংকারের বেদীমূলে আত্মবিসর্জন করিল সেই মুহূর্তেই তাহার সকল অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, সমস্ত ঐশ্বর্য তাহার খসিয়া গেল, একটা বিরাট শূন্যতার মধ্যে সে 'গৃহচ্যুত হতজ্যোতি' তারকার মতন কোথায় যে গিয়া পড়িল তাহার ঠিকানা নাই। রঘুপতির এই যে একান্ত রিক্ততা, ইহাই নাটকের করুণতম ও চরমতম ট্রাজেডি; এই ট্রাজেডিটুকুর বিকাশ না হইলে, রঘুপতি চরিত্রের শেষ পরিচয় কিছুতেই আমরা পাই না।

শুধু এই রঘুপতি চরিত্রের জন্যই পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের পর সমস্ত নাটকটির উপর যবনিকাপাত আমরা কল্পনা করিতে পারিলেও সাহিত্য সৃষ্টির দিক হইতে হয়ত তাহা সার্থক হইত না। একথা ভুলিলে চলিবে না যে 'বিসর্জন' শুধু নাটক নহে, শুধু অভিনয়ই উদ্দেশ্য নহে, তাহা কাব্য-নাট্য, তাহার একটা কাব্যের দিক আছে, সাহিত্যের দিক আছে। আর, শুধু নাটকের দিক হইতে দেখিলেই জয়সিংহের বিসর্জন দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকাপাত হইলে নাটকের কলাকৌশল একটু ক্ষুণ্ন হইত বলিয়া মনে হয়। কারণ, তাহা হইলে একটা বেদনাময় অস্থিরতার মধ্যে নাটকটির সমাপ্তি ঘটিত; নাটকীয় কলাকৌশলের দিক হইতে তাহা হয়ত খুব ভাল হইত না, রবীন্দ্রনাথও হয়ত তাহা চাহেন নাই, এবং চাহেন নাই বলিয়াই আখ্যান-বস্তুটিকে একেবারে শেষ যুক্তিসহ পরিণতি পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়া একটা স্থির অবিচল শান্তির মধ্যে সমস্ত নাটকটির উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন, পাঠক অথবা দর্শককে কোন অস্থির চঞ্চল করুণ ব্যাথাভারগ্রস্ত ভাবনার মধ্যে আন্দোলিত হইবার সুযোগ দেন নাই।... 'বিসর্জনে' তেমন কিছু কেন্দ্রবস্তু নাই বটে, কিন্তু তাহার রহস্যটি রহিয়াছে ঐ রঘুপতি চরিত্রের চরম পরিণতিটুকুর মধ্যে; সেই পরিণতিটুকু বিকশিত হইয়া না উঠিলে 'বিসর্জন' নাটকের সমাপ্তি কল্পনা করা একটু কঠিন।

...'বিসর্জনে' রঘুপতি চরিত্রের মধ্যেই নাটকটির করুণতম ও চরমতম ট্রাজেডিটুকু নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও একথাটা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, জয়সিংহের বিসর্জন দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে রঘুপতি চরিত্রের প্রতি আমাদের আকর্ষণ

অনেকটা কমিয়া যায়, রঘুপতি চরিত্রের একান্ত রিক্ততার যে ট্রাজেডি তাহা আমাদের চিত্তকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসে না। নাটকীয় সংস্থানও যেন কতকটা শিথিল হইয়া পড়ে। আমার মনে হয় তাহার একটা কারণ আছে। অত্যন্ত করুণ ব্যর্থতার মধ্যে যাহাদের জীবনের অবসান হইয়াছে, এমন দুইটি চরিত্র 'বিসর্জনে' পাশাপাশি রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে; একটি জয়সিংহের একটি রঘুপতির। জয়সিংহের যে ট্র্যাজিক পরিণতি, তাহা একটু দৃশ্যময়, কিন্তু রঘুপতির যে পরিণতি, তাহার যে রিক্ততা তাহা দৃশ্যময় ত নয়ই,একেবারে মনের গভীরতম অনুভূতির মধ্যে নিহিত। জয়সিংহের যে পরিণতি তাহা ঘটনার মধ্যে ফুটিয়া উঠে, কিন্তু রঘুপতির পরিণতি শুধু সুরের মধ্যে ধ্বনিত হয়, অনুভূতির মধ্যে রণিত হয়; একটির পরিণতির মধ্যে রহিয়াছে নাটকীয় ধর্ম, আর একটির পরিণতির মধ্যে রহিয়াছে গীতধর্ম। সেই জন্যই একটা খুব আন্দোলনের মধ্যে চিত্ত মথিত হইয়া যাইবার পর গানের সুরের মধ্যে মন শান্তি ও বিশ্রাম কামনা করে বটে, কিন্তু নাটকীয় বস্তুর কিংবা নাটকীয় আর কোনও চরিত্রের প্রতি আকর্ষণ আর ততটা থাকে না, কিংবা আর কোনও গভীরতর ট্রাজেডির জন্য মনটা আবার নূতন করিয়া নাট্যবস্তুর মধ্যে ঢুকিতে চায় না; ইহা অপেক্ষা গভীরতর ট্র্যাজেডি যে এখনও রহিয়া গিয়াছে তাহাও ভাবিতে পারে না। তবু যদি সে ট্র্যাজেডির মধ্যে একটা সমান নাটকীয় ধর্ম থাকিত তাহা হইলে মনটা সহজেই সজাগ হইয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু তাহা এতটা গীতধর্মী যে, রহস্যসৃষ্টি হিসাবে তাহা জয়সিংহ-চরিত্র অপেক্ষা অনেক বেশি মূল্যবান হইলেও নাট্য-বিন্যাসের দিক হইতে সে-চরিত্রের পরিণতি কতকটা শিথিল না হইয়া পারে না।

এই যে গীতধর্মের কথা বলিলাম তাহা অর্পণার চরিত্রে আরও বেশি প্রকাশ পাইয়াছে। অর্পণা একটি গানের সুর; তাহার সমস্ত চরিত্রের মধ্যে যে জিনিসটি ফুটিয়াছে তাহা একান্তই গীতধর্মী। 'বিসর্জনে'র মতন নাটকেও এই গীতধর্ম সমস্তকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে; শুধু তাহা অর্পণার চরিত্রে নয়, শুধু তাহা রঘুপতির রিক্ত অবসানের মধ্যে নয়, সমস্ত নাটকটির প্রত্যয় প্রকাশের ভঙ্গিমার মধ্যেও। আসল কথা হইতেছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই মূলত গীতধর্মী—গানের প্রতিভা, কবিতার প্রতিভা, সুরের প্রতিভা। তাঁহার অসংখ্য গান ও কবিতার কথা ছাড়িয়া দিয়া ছোটগল্প ও রূপক নাট্যগুলির দিকে তাকাইলে একতা স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি হইবার কথা নয়। নাটক তিনি অনেক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু একথা বলিতেই হয় তাঁহার প্রতিভা ঐতিহ্যগত নাটকের প্রতিভা নয়; নাটকের মধ্যে নাটকীয় ধর্ম তত নাই যত আছে গীতধর্ম, সুরধর্ম।

(রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা)

বিসর্জন

কাজী আবদুল ওদুদ

কবি তাঁর 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথমাংশ ও শেষের দিকের কয়েকটি পরিচ্ছেদ থেকে উপকরণ নিয়ে তাঁর 'বিসর্জন' নাটক দাঁড় করান—১২৯৬ সালের শেষের দিকে সাজাদপুরে নির্জন বাসকালে। সেই নির্জনবাসে এই নাটকটিকে রূপ দেওয়ার গভীর অনন্দ এর উৎসর্গ-পত্রে ব্যক্ত হয়েছে। এটি প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে, কিন্তু বহুলভাবে পরিবর্তিত হয় ১৩০৩ সালে। ১৩০৬ সালেও এর কিছু পরিবর্তন ঘটে। পরে পরেও এই নাটকে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু বর্তমানে রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'বিসর্জন' নাটকটিকে যে আকারে পাওয়া যাচ্ছে তা মোটের উপর ১৩০৩ ও ১৩০৬ সালের সংস্করণ-গ্রন্থপরিচয়ে একথা বলা হয়েছে। 'রাজর্ষির অনেক চরিত্র এতে নেই, আর রাণী গুণবতী, অপর্ণা, নয়নরায়, ও চাঁদপাল এতে কবির নতুন সৃষ্টি।

এর একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা কবি নিজে দিয়েছেন তাঁর একটি 'শান্তিনিকেতন' ভাষণে। চারুবাবুর গ্রন্থে সেটি উদ্ধৃত হয়েছে। কবির মতে, এটি নাটকে দুই শক্তির মধ্যে সংগ্রাম চলছে—প্রাচীন প্রথার শক্তি আর প্রেম ও করুণার শক্তি। বৃদ্ধ সম্মানিত ও শক্তিশালী পুরোহিত রঘুপতি হচ্ছে সেই প্রাচীন প্রথার—নিষ্ঠুর জীববলির—প্রতিনিধি, আর প্রেম ও করুণার শক্তির প্রতিনিধি হচ্ছে বালিকা ভিখারিনী সমাজে অখ্যাতা অপর্ণা। কিন্তু নগন্য অপর্ণাই প্রতাপশালী রঘুপাতির বিরুদ্ধে জয়ী হ'ল। তাঁর পালিত ছাগশিশু মন্দিরের লোকেরা কেড়ে এনে দেবীর কাছে বলি দিয়েছে এজেন্যে তাঁর অন্তরে যে গভীর বেদনা বেজেছে সেটি সহজেই মহৎহৃদয় রাজা গোবিন্দ মানিক্যকে প্রেম ও করুণার সত্যে উদ্বুত করলো, মন্দিরের সেবক ও রঘুপতির পালিতপুত্র কোমলহৃদয় জয়সিংহকে অচিরে জীববলির অবাঞ্ছিতত্ব সম্বন্ধে অনেকটা সচেতন করে তুললো, আর শেষে প্রতাপে অন্ধ কঠিন-হৃদয় রঘুপতিকেও নির্মম অভিজ্ঞাতার ভিতর দিয়ে প্রেম ও করণার পথেই নিয়ে এল।

সহজেই মনে হতে পারে কবির অপর্ণা একটি বাস্তব মানুষের চরিত্র ঠিক হয় নি, হয়েছে বরং একটি idea-র, ভাবের, প্রতীক। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই ব্যাপারটি ঘটেনি। কবির সৃষ্টি অপর্ণার অন্তরে প্রেম ও করুণার শক্তি এতখানি প্রাণবন্ত হয়েছে যে তাঁর সেই অনাড়ম্বর কিন্তু অব্যর্থ শক্তির সামনে প্রাচীন সংস্কারের সব বাধা সহজেই ভেঙে পড়েছে। অপর্ণা যে একটি মহৎ চিন্তার প্রতীক মাত্র না হয়ে একটি প্রাণবন্ত সত্য হয়েছে এই-জন্যই 'বিসর্জন' কবির একটি মহৎ সাহিত্যিক সৃষ্টি হতে পেরেছে। গ্যেটের ইফিগেনিয়া-র সঙ্গে এর তুলনা চলে। অবশ্য 'বিসর্জনে'র শেষের অংশে

গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতি এই দুইটি বড় চরিত্রেই ভাবালুতা প্রশ্রয় পেয়েছে—জয়সিংহে তো পেয়েছেই। বোঝা যাচ্ছে ভাববিভোরতার কাল কবির কেটে যায়নি। কিন্তু অপর্ণার উপলব্ধির সত্যতা এর সর্বত্র যথেষ্ট প্রাণসম্পদ ছড়িয়ে দিয়ে এক ভাবাতিশয্য থেকে রক্ষা করতে পেরেছে।

'বিসর্জন' কবির একটি সত্যিকার প্রাণসমৃদ্ধ রচনা–আর সেই প্রাণ মহত্বের অভিসারী। তাই এর জনপ্রিয়তা হ্রাস পাবে না মনে হয় যদিও সমালোচকরা এর বহু ত্রুটি খুঁজে বার করতে পারেন।

'রাজা ও রাণী' আর 'বিসর্জন' কবির ই দুইটি নাটক অল্পকালের ব্যবধানে রচিত। অথচ সার্থকতার দিক দিয়ে দুটিতে পার্থক্য কত! মনে হয় এর বড় কারণ, বিষয়ের পার্থক্য। 'বিসর্জনে'র বিষয়টি 'রাজা ও রাণী'র তুলনায় ব্যাপকভাবে জীবনধর্মী, আর সমাজের একটি দৃঢ়মূল প্রথার বিরুদ্ধে, অথবা, সমাজের বহুকালের অন্ধ গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে, কবি তার সমস্ত অন্তরকে সচেতন করে তুলতে পেরেছেন বলে এই রচনায় একটি স্বাস্থ্যপূর্ণ মানস শক্তির সঞ্চার হয়েছে। এর পূর্বে কবি খেয়ালী অথচ প্রতাপশালী 'পুনরুজ্জীবনবাদী'দের বিরুদ্ধে যেসব মসীযুদ্ধ চালিয়েছিলেন তাঁর 'বিসর্জন' নাটককে জ্ঞান করা যেতে পারে সে সবের এক সুমহৎ পরিণতি। বিশ্বজগৎ পরিচালিত হচ্ছে যে শক্তির দ্বারা তা অজ্ঞেয়, নির্মম: 'করুণাময়' 'জ্ঞানময়' এসব বিশেষণে তাকে বিশেষিত করা যায় না; 'পুনরুজ্জীবনবাদী'দের এই–সব কথার উত্তরে কবির এক দৃপ্ত প্রাণময়–প্রত্যয়ের ঘোষণা এই 'বিসর্জন'।

(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।)

বিসর্জন

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

'বিসর্জন' নাটকের আখ্যানভাগ 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথমার্দ্ধ হইতে নেওয়া। উপন্যাসে যতটা ঘটনা সন্নিবেশ করা যায় নাটকে ততটা পারা যায় না। সাধারণতঃ অল্প কয়েকটি ঘটনার মধ্যে নাটক তাহার সমস্ত রস ঢালিয়া দেয়; উপন্যাসের বিস্তৃত তাহার মধ্যে নাই। 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জন' নাট্যের আখ্যানভাগে খানিকটা বৈসাদৃশ্যও আছে। উপন্যাসের হাসি ও তাতাকে খুব মূখ্য করা হইয়াছে। নাটকে তাতাকে দেখিতে পাই; কিন্তু সে কথা বলে না এবং তাহার স্থান অনেক ছোট করা হইয়াছে। হাসি নাটকে নাই; তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে ভিখারিণী অপর্ণা। হাসিকে নাটকে রাখিলে নাটকের ক্ষতি হইত না। গোবিন্দ্রমানিক্যের মনে বলির বিরুদ্ধে যে বিতৃষ্ণা জাগিয়াছিল তাহার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যাইত। অপর্ণা তাহার ছাগশিশুর জন্য যে ক্রন্দন করিয়াছে তাহার বর্ণনা খুব ভালই হইয়াছে; কিন্তু রক্ত দেখিয়া হাসি যে বিস্মিত প্রশ্ন করিয়াছিল এবং তাহাতে রক্তপাতের বীভৎসতা যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল নাটকে তাহার অনুরূপ কিছুই নাই। নাটকের আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন জয়সিংহের মৃত্যুও রঘুপতির চিত্তে তাহার প্রভাবের বর্ণনায়। উপন্যাসে জয়সিংহের মৃত্যুতেও রঘুপতির চিত্তে প্রতিহিংসার বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং তিনি ধ্রুবকে বলি দিতে চাহিলেন, কারণ তাহা হইলে রাজার সঙ্গে শোধবোধ হইবে। নাটকে দেখিতে পাই যে, জয়সিংহের মৃত্যুতে তাঁহার লুক্কায়িত স্নেহফল্গুধারা উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। উভয়রূপ পরিবর্তনই সম্ভব। কিন্তু নাটকের চিত্র অধিকতর রমণীয় হইয়াছে। উপন্যাসে দেখিতে পাই যে, রঘুপতির জীবনে তখনই পরিবর্ত্তন আসিল যখন নক্ষত্ররায় তাঁহাকে আর গ্রাহ্য করে নাই এবং অপমান করিয়াছে। তিনি যেন দায়ে পড়িয়া সাধু হইলেন। নাটকে আরও একটি জিনিস আছে; তাহা হইতেছে গুণবতীর চরিত্র। 'রাজর্ষি' উপন্যাসে চরিত্রের বা ঘটনার অভাব নাই। কিন্তু গোবিন্দ্রমানিক্যের পারিবারিক জীবনের কোন চিত্র আমরা পাই না। নাটকে গুণবতীকে আনিয়া কবি এই অভাবটি পূরণ করিয়াছেন এবং ধ্রুবহত্যার চেষ্টার সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এইত গেল নাটকেরে সঙ্গে উপন্যাসের তুলনামূলক সমালোচনা। 'বিসর্জন' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। রঘুপতি, গোবিন্দমাণিক্য, ইহারা প্রত্যেকেই বিরাট মানব। রঘুপতির মধ্যে রহিয়াছে সংস্কারের অপরিসীম তেজ, আর গোবিন্দমাণিক্যের নবজাগ্রত অনুভূতি আজন্মার্জ্জিত সংস্কারের মতই বেগবান; এই দুই বিরাট মানবের সংঘর্ষ এই ট্র্যাজেডির প্রধান উপাদান। বিষয়গৌরবে এই নাটক কাহারও অপেক্ষা হীন নহে। গোবিন্দমানিক্যের শুধু যে রঘুপতি ও প্রজাদের বিরুদ্ধেই নিজের মত দৃঢ় রাখিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে আরও নিকটতর, প্রিয়তর লোকের বিরুদ্ধে । তাঁহার স্ত্রী নিঃসন্তান। হিন্দুরমণীর স্বাভাবিক সংস্কার তো তাঁহার আছেই; তারপর বলির সাহেয্যে রাণী দেবতার বর লাভ করিতে চাহেন, যে বর তাঁহাকে সন্তান দিয়া তাঁহার জীবনের অভিশাপ ঘুচাইয়া দিবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতির দ্বন্দ্বে ট্র্যাজেডির উপকরণ রহিয়াছে। ট্র্যাজেডিতে যাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ হইবে তাহারা অসাধরণ ব্যক্তি হইবে, একথা সমালোচকদের নিকট শুনিতে পাই। অবশ্য আজকাল সাম্যবাদের দিনে সাধারণ মানব লইয়া ট্র্যাজেডির রচনা হয়, সেখানে সংঘর্ষ হয় বিরাট সামাজিক শক্তির সঙ্গে। কিন্তু যে ট্র্যাজেডির মূল কথা হইতেছে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, সেখানকার পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিরা

একেবারে ক্ষীণজীবী হইলে চলিবে না। গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতির মনের দৃঢ়তা অনমনীয়; তাই ইঁহাদের সংঘর্ষে একটি মহত্ত্ব আছে, যাহা সামান্য নরনারী কাহিনীতে পাওয়া কঠিন। তবে একটি বিষয় ত্রুটি আছে বলিয়া মনে হয় । শ্রেষ্ঠ ট্যাজেডিতে শুধু যে বাহিরের উত্থান-পতনের কথা রচিত হয় তাহা নহে, নায়কের মনের নানাভাবের ঘাতপ্রতিঘাতের চিত্রও দেওয়া হইয়া থাকে এবং এই শেষোক্ত দ্বন্দ্বই শেক্সপীয়র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের নাটকের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু 'বিসর্জন' নাটকে পরস্পর বিরোধী দুইটি নায়কের মনের কোন দ্বন্দ্ব নাই। বলি বন্ধ করাতে ভ্রাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে ইহার জন্য রাজা দুঃখিত; কিন্তু নিজ কর্তব্য সম্পর্কে তাঁহার মনে কোন দ্বিধা আসে নাই। রঘুপতির কঠিন চিত্ত জয়সিংহের জন্য স্নেহমমতায় ভরপুর, কিন্তু ইহার জন্য বলির ঔচিত্য সম্বন্ধে তিনি কখনও সন্দিহান হন নাই। জয়সিংহের মৃত্যুর পর তিনি অপর্ণাকে মা বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন ও দেবীপ্রতিমার মধ্যে মাতার প্রাণ নাই এ কথা বলিয়াছেন "কিন্তু ইহা ধর্মান্তর গ্রহণের মত শোনায় এবং ইহার সঙ্গে নাটকেরও অবসান হইয়াছে । যতদিন তিনি স্বীয় ধর্মে বিশ্বাস করিতেন, ততদিন মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হয়েন নাই; আর যেদিন তাহাকে ছাড়িলেন, একেকারেই ছাড়িলেন। প্রধান নায়কদ্বয়ের মধ্যে বিশেষতঃ গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্বের যে অভাবের কথা সূচিত হইল, ইহা অপরাধ এমন কথা বলা যায় কিনা জানি না, কিন্তু এই শ্রেণীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ নাটকে যাহা পাওয়া যায় তাহা এই নাটকে নাই। তাই ইহা একটু অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

মানসিক দ্বন্দের কঠিন নিপীড়ন দেখিতে পাই জয়সিংহে। রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্যের সংঘর্ষ যে কত কঠোর তাহার জীবন্ত প্রমাণ জয়সিংহ। সে উভয়কেই চিনে, উভয়ের প্রভাবই তাহার জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে। ইঁহাদের দ্বন্দ্বের সে কোন মীমাংসা করিতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে পড়িয়া তাহার হৃদয় নিপীড়িত, ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। শেষে মৃত্যুর শীতল স্তব্ধতায় সে তাহার কঠিন সমস্যা হইতে মুক্তি পাইয়াছে। এই দিকে দিয়া দেখিতে গেলে জয়সিংহ চরিত্রের পরিকল্পনা অতি ও অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু প্রধান নায়কদের চরিত্রে যে অন্তদ্বর্ন্দ্বের অভাব আছে ইহাতে অভাবের পূরণ হয় না। জয়সিংহ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলচিত্ত লোক। তাহার প্রাণ দিবার শক্তি আছে, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বকে মুদ্রিত করিবার মত বুদ্ধি বা তেজ নাই। কাজেই সে নাটকের নায়কদের পদ পাইতে পারে না। ট্যাজেডির নায়কের ইতিহাস মনে বিস্ময় ও ত্রাসের সঞ্চার করে; জয়সিংহের মৃত্যু করুণার উদ্রেক করে।

এই নাটকের আর একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি অপর্ণা। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন,"অপর্ণা 'প্রকৃতির পরিশোধে'র অনাথ বালিকার আর একটু উন্নততর সংস্করণ; কিন্তু তাহার অবিমিশ্র. একটানা খেদবাণী নাটকের প্রকৃতির সহিত খাপ খায় নাই।" অপর্ণার সঙ্গে অনাথ-বালিকার মৌলিক পার্থক্য আছে। 'প্রকৃতির পরিশোধ' নাটিকার অনাথ-বালিকা শুধু সন্ন্যাসীর হৃদয়ে স্নেহ জাগাইয়াছে; তাহার নিজের ব্যক্তিত্বের জোর নাই। অপর্ণার মধ্যে এই জিনিসটি আছে। তাহার বক্তৃতা একটানা এবং নাটকের পক্ষে অতিশয় দীর্ঘ, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে ইহা শুধু অপর্ণার একার দোষ নহে; গীতিকাব্যমিশ্রিত নাটকেরই ইহা একটা লক্ষণ। অপর্ণার মধ্যে একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে—বিশ্বাসের নিঃসঙ্কোচ তেজ। সে শুধু খেদ করে নাই, নালিশ করিয়াছে, অপর পক্ষকে ঘৃণার দ্বারা নতশির করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বলির নৃশংসতা সে যেমন অনুভব করিয়াছে এমন আর কেহ নহে। যে সংস্কারের বিরুদ্ধে গোবিন্দমাণিক্য যুদ্ধ করিয়াছেন, যাহার প্রভাবে অন্য সকলেই প্রভাবান্বিত, তাহা তাহাকে স্পর্শ করিতেই পারে নাই। সে রহিয়াছে নাটকের দ্বন্দ্বের বাহিরে এবং বাহির হইতে তাহার আহ্বান আসিয়া জয়সিংহকে উদ্বেলিত করিয়াছে।

(রবীন্দ্রনাথ)

ড. মিল্টন বিশ্বাস
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।